এপিটাফ

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. খুব ভালো ঘুম 2
২. টেলিফোনের শব্দে 33
৩. মতিঝিলের বারোতলা দালান 56
৪. দুপুরে ঘুমুচ্ছিলাম 74
৫. সাজ্জাদ বারান্দায় বসে আছে 97
৬. আজ ভিসা হলো 129
৭. মার কিছু একটা হয়েছে 155
৮. প্রচণ্ড বর্ষণ হচ্ছে....................168
৯. ফুলির মা শেষপর্যন্ত 186

১. খুব ভালো ঘুম

এপিটাফ – হুমায়ূন আহমেদ

শেফার স্মৃতির উদ্দেশে
কালান্তক ব্যাধি বাসা বেঁধেছিল মেয়েটির ছোট্ট শরীরে। সে সেই ব্যাধিকে অগ্রাহ্য করল। মৃত্যুকে গ্রহণ করল অসীম সাহসিকতায়। কে জানে মেয়েটির সাহস দেখে হয়তো মৃত্যুও লজ্জা পেয়েছিল।

.

"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।"

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

.

০১.

কাল রাতে আমার খুব ভালো ঘুম হয়েছে। ঘুমের মধ্যে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখি নি। শুধু সারাক্ষণই কেমন যেন শীত শীত করছিল, একটা হিম হাওয়া শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। মাঝেমাঝেই অস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছিল কেউ যদি গায়ে একটা পাতলা চাঁদর টেনে

দিত। আবার মনে হচ্ছিল, গায়ে চাঁদর না থাকাই ভালো। চাঁদর থাকা মানেই হিম হিম ভাব নষ্ট হয়ে যাওয়া।

সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখি গায়ে চাঁদর আছে। গলা পর্যন্ত টেনে দেয়া পাতলা সুতির চাঁদর। ঘুমুতে যাবার সময় আমার বিছানায় কোনো চাঁদর ছিল না। এই কাজটা নিশ্চয়ই মা করেছেন। মার ঘর আর আমার ঘরের মাঝখানে একটা দরজা আছে। আগে দরজা বন্ধ থাকত কিংবা ভেজানো থাকত। এখন খোলা থাকে। একমাস আগেও দরজায় সাদার উপর সবুজ প্রিন্টের একটা পর্দা ঝুলত। এখন সেই পর্দাও মা সরিয়ে ফেলেছেন। এটা করা হয়েছে যাতে তার খাটে শুয়ে মা আমাকে দেখতে পারেন। মাঝেমাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি মা একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এটা আমার অপছন্দ, খুব বেশিরকম অপছন্দ। কেন মা গভীর রাতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন? আমার বয়স এখন তের। এই বয়সের মেয়েরা তাদের অপছন্দের কথা কঠিন গলায় বলতে পারে। আমিও পারি, কিন্তু বলি না। আমার বলতে ইচ্ছা করে না।

আমি মেয়েটা আসলে কেমন তা আমার মা জানেন না। আমার বাবাও জানেন না। আমি সারাক্ষণ ভান করি, কেউ তা ধরতে পারে না। মাঝে মাঝে আমি নিজেও ধরতে পারি না। নিজের ভানগুলি আমার নিজের কাছেই একসময় সত্যি বলে মনে হয়। তখন নিজেরই খুব আশ্চর্য লাগে।

ভোরবেলা মা আমার ঘরে ঢুকে প্রথম যে বাক্যটি বলেন তা হচ্ছে– কী রে নাতাশা, আজ শরীরটা কেমন? আমি মুখ টিপে হাসি, যে হাসির অর্থ শরীর খুব ভালো। এবং আমি মার মুখ থেকে দিনের শুরুর প্রথম বাক্যটি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। আসলে পুরোটাই

ভান। আমার শরীর মোটেই ভালো না। এবং আমি দিনের প্রথম বাক্যটি শুনে রাগ করেছি কারণ নাতাশা আমার নাম না। আমার খুব সুন্দর একটা নাম আছে– টিয়া। আমার জন্ম হয় নেত্রকোনার নান্দাইলে, আমার দাদার বাড়িতে। হিসেব মতো আমার জন্য আরো মাসখানিক পরে হওয়ার কথা। বাবা মাকে নিয়ে অসুস্থ দাদাজানকে দেখতে নান্দাইল গিয়েছিলেন। যেদিন পৌঁছলেন সেদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মা'র প্রসবব্যথা উঠে গেল। বাবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ভয়াবহ ধরনের গণ্ডগ্রামে কোথায় পাওয়া যাবে ডাক্তার, কোথায় কী? খুঁজে পেতে দাই আনার আগেই আমি পৃথিবীতে চলে এলাম। আমার জন্মের পর পর দাদাজানের কাঁঠাল গাছ থেকে ঝাকে ঝাকে টিয়া পাখি আকাশে উড়ে গিয়েছিল। আমার বাবা বারান্দায় খুব মন খারাপ করে বসেছিলেন। টিয়া পাখির ঝাক দেখে তার মনে খুব আনন্দ হলো। তার কিছুক্ষণ পরেই বাবাকে আমার জনের খবর দেয়া হলো। বাবা বললেন, আমার মেয়ের নাম হলো টিয়া।

টিয়া নামটা কাবোরই পছন্দ না, কারণ পাখির নামে নাম রাখলে পাখির মতো। স্বভাব হয়। ঘরে নাকি মন টেকে না। কিন্তু নামটা আমার খুব পছন্দ। মা আমার এত পছন্দের নাম ধরে না ডেকে নাতাশা ডাকেন। আমার রাগ লাগে, তারপরেও আমি মুখ টিপে হাসি। আনন্দের ভান করি। মা সেই ভান ধরতে পারেন না। তিনিও হাসেন। আমার মতোই মুখ টিপে হাসেন।

মুখ টিপে হাসলে মাকে অসম্ভব সুন্দর লাগে। অবশ্যি না হাসলেও তাকে সুন্দর লাগে। তিনি যখন রাগ করে থাকেন তখনো সুন্দর লাগে। তখনো তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। যারা সুন্দর তারা সবসময় সুন্দর, হাসিতেও সুন্দর কান্নাতেও সুন্দর। আমার চেহারা মোটামুটি। এখন অবশ্যি খুব খারাপ হয়েছে। আমি যখন হাসি তখন আমাকে খুব

সম্ভব অতি কুৎসিত লাগে। হাতের কাছে একটা আয়না থাকলে একবার দেখতাম। হাতের কাছে কোনো আয়না নেই। মা'র কঠিন নির্দেশে আমার ঘর থেকে সব আয়না সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কারণ আমি এখন প্রায় একটা পোকার মতো হয়ে গেছি। মানুষের মতো হাত-পাওয়ালা একটা পোকাকে সুন্দর জামা-কাপড় পরিয়ে শুইয়ে রাখলে যেমন দেখায়, আমাকেও নিশ্চয়ই সেরকম দেখায়। আমি সেটা বুঝতে পারি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে। যারা প্রথমবারের মতো আমাকে দেখে তাদের চোখে একটা ধাক্কা লাগে। সেখানে একটা ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে। সেই ঘৃণার জন্যে তারা লজ্জিত হয়। লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের চোখে একটা অসহায় ভাব জাগে। আমি বুঝতে পারি। দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। সেই অনেক কিছুর একটা হচ্ছে চোখের ভাষা বুঝতে পারা।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙেই একটা কুৎসিত পোকা দেখতে কারো ভালো লাগার কথা না। আমার মা'রও নিশ্চয়ই ভালো লাগে না। আমি জানি, ভালো না লাগলেও আমার মাকে এই দৃশ্য আরো কিছুদিন দেখতে হবে। কত দিন তা কি মা'র জানা আছে? মনে হয় না। তবে ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই জানেন। জানলেও তারা মাকে জানাবেন না। কোনো ডাক্তারের পক্ষেই কোনো মাকে বলা সম্ভব না আপনার মেয়ের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। সে আর মাত্র এতদিন বাঁচবে।

ডাক্তার সাহেব আমাকে যদি চুপি চুপি ব্যাপারটা জানিয়ে দিতেন তাহলে আমার খারাপ লাগত না। কে জানে, হয়তো ভালোই লাগত। ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখতাম। সেই দাগ দেয়া তারিখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু ঠিক করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু কেউ ব্যাপারটা আমার মতো করে দেখছে না। সবাই ভাবছে, আমি খুব বাচ্চা একটা মেয়ে।

মৃত্যু কী তা-ই আমি পরিষ্কার জানি না। আমাকে নানান ধরনের মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখতে হবে। আমাকে ভুলানোর তাদের চেষ্টা এত হাস্যকর! আমার পেটের ভেতর হাসি গুড় গুড় করে ওঠে। কিন্তু আমি তাদের তা বুঝতে দেই না। আমি ভান করি যেন তাদের প্রতিটি বাক্য আমি বিশ্বাস করছি।

মা আমাকে গত মাসের ৯ তারিখে পিজির নিওরোসার্জন প্রফেসর ডা. ওসমানের কাছে নিয়ে গেলেন। মা'র সঙ্গে ভদ্রলোকের আগেও কয়েকবার দেখা হয়েছে। আমি এই প্রথম তাকে দেখছি। খুব ফর্সা ছোটখাটো ধরনের মানুষ। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চশমার কাঁচ ভারি বলে চোখ দেখা যাচ্ছে না, তবে আমার মনে হলো দ্রলোকের চোখ সুন্দর। খুব সুন্দর।

আমার কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এই যেমন চোখ দেখছি না, তারপরেও মনে করে নিলাম চোখ সুন্দর। মাঝে মাঝে একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে বইয়ের নাম, লেখকের নাম না পড়েই মনে হয়– বইটা খুব সুন্দর। হয়ও তাই। এই ডাক্তার সাহেবের চোখ নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে। আমি অপেক্ষা করছি কখন তিনি চোখ থেকে চশমা সরাবেন। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একসময় তিনি চোখ থেকে চশমা সরাবেন। কিংবা চশমাটা আপনাতেই একটু নিচে নেমে যাবে। ডাক্তার সাহেব খুব মন দিয়ে কাগজপত্র দেখছেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম, কাগজপত্র দেখতে দেখতে ভদ্রলোকের চেহারাটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। একবার মার দিকে, একবার আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ খুব স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এখন তিনি আর কোনো কাগজই মন দিয়ে দেখছেন না, আবার আমার দিকেও তাকাচ্ছেন না। শুধু পাতা ওল্টাচ্ছেন। আমার মনে হলো তিনি নিজেই এখন নিজের উপর

বিরক্ত হচ্ছেন। তারপর হঠাৎ হাতের কাগজগুলি একপাশে সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন খুকি, তুমি কিছু খাবে না? কোল্ড ড্রিংকস বা অন্য কিছু?

আমি কিছু বলার আগেই মা বললেন, ও কিছু খাবে না। ওকে আপনি কেমন দেখলেন বলুন?

মা'র গলা খুব কঠিন শুনাল। যেন তিনি খুব বিরক্ত। এমনিতে মা'র গলার স্বর নরম ও আদুরে। শুধু বাবার সঙ্গে কথা বলার সময় সেই স্বর কঠিন হয়ে যায়। এখন দেখছি এই ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথা বলার সময়ও স্বর কঠিন হয়ে গেল। শুধু তাই না, তার ভুরু কুঁচকে গেল।

ডাক্তার সাহেব চোখ থেকে চশমা সরিয়ে এখন চশমার কাঁচ পরিষ্কার করছেন। আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের চোখ দেখছি। আশ্চর্য, এত সুন্দর চোখ!

ডাক্তার সাহেব চুপ করে আছেন। মা আবারো বললেন, আমার মেয়ের অবস্থা কেমন দেখলেন বলুন?

ডাক্তার সাহেব শান্ত গলায় বললেন, ভালোই।

আমি লক্ষ করলাম তিনি শুধু ভালো বললেন না। ভালোর সঙ্গে একটা 'ই' যোগ করে দিলেন। ভালোটাকে করলেন ভালোই। যার মানে আসলে ভালো নয়।

মা বললেন, ভালোই বলতে কী বুঝাচ্ছেন?

অবস্থা যা ছিল তারচে' খারাপ হয় নি। মনে হচ্ছে লোকালাইজড গ্রোথ। যাই হোক, আরেকটা রেডিও নিওক্লাইড ব্রেইন স্কেন করাতে হবে।

সেটা তো একবার করানো হয়েছে।

ঐ স্কেন করাতে টেকনিসিয়াম ডিটিপিএ ইনজেকশান দিতে হয়। রেডিওঅ্যাকটিভ মেটিরিয়েলের ইনজেকশান। আগেরবার ইনজেকশানে কিছু সমস্যা ছিল, স্কেনিং ভালো হয় নি।

মা কঠিন গলায় বললেন, এবার যে ভালো হবে তার নিশ্চয়তা কী?

এবারে আমি পাশে দাঁড়িয়ে থেকে করাব।

মা হ্যান্ডব্যাগ থেকে রুমাল বের করতে করতে বললেন, আপনারা শুধু টেস্টের পর টেস্ট করছেন। আজ এই টেস্ট, কাল ঐ টেস্ট। চিকিৎসা শুরু করছেন না। দয়া করে চিকিৎসা শুরু করুন। আর আপনারা যদি মনে করেন চিকিৎসা করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আপনাদের নেই তাহলে সেটাও পরিষ্কার করে বলুন। আমার মেয়েকে আমি বাইরে নিয়ে যাব। দেশের ডাক্তারদের উপর থেকে আমার বিশ্বাস চলে যাচ্ছে।

এ জাতীয় কথায় যে-কোনো ডাক্তারের রাগ হবার কথা। তিনি রাগ করলেন। তিনি তার অবিশ্বাস্য সুন্দর চোখে মার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন মা অবুঝ এক কিশোরী যার কথা ধরতে নেই।

আমার গাল ঘামছে, মা রুমাল দিয়ে গালের ঘাম মুছে দিচ্ছেন। মানুষের কপাল ঘামে, আমার ঘামে শুধু গাল। অসুখের পর এটা হয়েছে। আমি কাউকে বলি নি। অসুখের কথা কারো সঙ্গে বলতে আমার ভালো লাগে না। ডাক্তারের সঙ্গেও না।

ডাক্তার সাহেব চশমা চোখে পরে মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি কফি খাবেন?

মা বললেন, না।

এক কাপ কফি খান। আমিও আপনার সঙ্গে খাব।

ডাক্তার সাহেব আবারো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, খুকি, তুমি কিছু খাবে?

আমি হাসিমুখে বললাম, হ্যাঁ।

কী খাবে? জুস?

উঁহু, আমিও আপনাদের মতো কফি খাব।

তিনি কফি আনার জন্যে কাউকে বললেন না। তাঁর ঘরেই কফিপটে কফি জ্বাল হচ্ছে। কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এতক্ষণ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল না। যেই কফি পট দেখলাম, ওমনি গন্ধ পাওয়া শুরু করলাম। ডাক্তার সাহেব নিজেই মগে করে কফি এনে দিলেন। বালতির মতো সাইজের মগ। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে বললেন, প্রফেসর এলেনা এডবার্গ নামে একজন বিখ্যাত নিওরোসার্জন আছেন– ফিলাডেলফিয়াতে থাকেন। তার সঙ্গে আমার খুব ভালো পরিচয় আছে। টরেন্টোর এক কনফারেন্সে প্রথম আলাপ হয়। ভদ্রমহিলার

বয়স চল্লিশের নিচে কিন্তু পৃথিবীজোড়া খ্যাতি। আপনার মেয়ের সব কাগজপত্র আমি তার কাছে পাঠিয়ে দেব। তার একটা মতামত নেব।

কবে পাঠাবেন?

কাল-পরশুর মধ্যেই পাঠাব।

কাগজপত্র পৌঁছতে পৌঁছতেই তো একমাস লাগবে।

না, তা লাগবে না। ফ্যাক্স চালু হয়েছে। আমেরিকায় চিঠি যেতে পাঁচ-ছ মিনিটের বেশি লাগার কথা না। আপনি কিন্তু কফি খাচ্ছেন না।

আমি তো আগেই বলেছি কফি খাব না।

তাহলে কি চা দেব? টি ব্যাগস আছে।

মা বিরক্ত গলায় বললেন, কিছুই দিতে হবে না। আমি আবার কবে আসব বলুন।

দিন পনের পরে আসুন।

আপনি বললেন কাগজপত্র যেতে লাগবে পাঁচ-ছ মিনিট। আমাকে পনের দিন পরে আসতে বলছেন কেন?

উনি তো আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবেন না। তাছাড়া আরেকটা স্কেনিং-এর রিপোর্ট লাগবে।

ঠিক করে বলুন তো–আমার মেয়ের সমস্যাটা কি আপনারা ধরতে পারছেন না।

পারছি– মেনিনজিওমা, তবে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। মাঝে মাঝে মেনিনজিওমার গ্রোথ ইলিউসিভ হয়। ধরা দিতে চায় না।

ভালোমতো ধরার চেষ্টা করছেন না বলে ধরতে পারছেন না।

আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না মা ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করছে কেন। এমনভাবে কথা বলছে যেন আমার অসুখটার জন্যে ডাক্তার সাহেবই দায়ী। এরকম ব্যবহার সাধারণত খুব পরিচিত মানুষের সঙ্গেই করা যায়। অপরিচিতের সঙ্গে করা যায় না। আমার ক্ষীণ সন্দেহ হলো, মা এই ডাক্তার সাহেবকে চেনেন। হয়তো ছোটবেলায় পরিচয় ছিল। হয়তো এই ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল, শেষটায় আর বিয়ে হয় নি। কিংবা কে জানে হয়তো প্রেম ছিল। বিবাহিত মেয়েদের সঙ্গে পুরনো প্রেমিকের দেখা হলে মেয়েরা চট করে রেগে যায়। মেজোখালার বেলা এটা আমি দেখেছি। মেজোখালার সঙ্গে মনসুর সাহেবের খুব প্রেম ছিল। এসব অবশ্যি আমার শোনা কথা, আমি তাদের প্রেম-ট্রেম দেখি নি। আমার জন্মের আগের ব্যাপার। মেজোখালার যখন অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হলো তখন তার একেবারে মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। এই কাঁদেন, এই হাসেন। তারপর ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেললেন। যমে-মানুষে টানাটানি অবস্থা। সেই মনসুর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে এখন তিনি ফট করে রেগে যান। নানান ধরনের অপমানসূচক কথা বলতে চেষ্টা করেন। আড়ালে ডাকেন ছাগলা বাবা। একেবারে রামছাগলা।

.

আমরা ফিরছি রিকশায়। আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসার সময় মা কীভাবে কীভাবে একটা গাড়ি জোগাড় করেন। আজ জোগাড় করতে পারেন নি। সেই জন্যেই কি তার মন খানিকটা খারাপ? তাকে কেমন রাগী রাগী লাগছে। রিকশায় চড়তেই আমার বেশি ভালো লাগে। রিকশার হুড ফেলে মাথা একটু উপরের দিকে তুললেই মনে হয় আমি শূন্যে ভাসছি। কিন্তু মা কখনোই রিকশার হুড ফেলবে না। বাবার বেলা সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার। রিকশায় উঠেই বাবা বলবে–মাই ডিয়ার টিয়া পাখি, হুড ফেলে দে।

বাবার স্বভাবের সঙ্গে মা'র স্বভাবের কোনো মিল নেই। রিকশায় উঠে মা কোনো কথা বলবেন না, মূর্তির মতো বসে থাকবেন। আর বাবা সারাক্ষণ কথা বলবেন। দুটাই অবশ্যি অস্বাভাবিক। একেবারে কথা না বলাও যেমন অস্বাভাবিক আবার সারাক্ষণ কথা বলাও অস্বাভাবিক।

আমার সঙ্গে বাবার একটা মিল হলো– বাবাও রিকশায় চড়তে খুব ভালোবাসেন। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এসে বলবেন, মাই ডিয়ার টিয়া পাখি, রিকশায় করে খানিকক্ষণ ঘুরবি নাকি? মা গেছে তোর মেজোখালার বাসায়। ঘণ্টা দুইয়ের আগে ফিরতে পারবে না। তার আগেই আমরা ফিরে আসব এবং আমরা আমাদের গোপন অ্যাডভেঞ্চারের কথা কাউকে কিছু বলব না। যাবি? আমি খুশি খুশি গলায় বললাম, যাব। বাবা বললেন–

টিং টিং টিটিং টিং।
রেবা রেবা লিং লিং।।

এটা হলো তাঁর চায়নিজ গান। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কিছু গান আছে। আরবি ভাষায় তার গানটা হলো

আহলান আহ আবু।
কাহলান কাহ কাবু।।

চায়নিজ গানটাই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। যখন তখন গুন গুন করেন।

বাবার সঙ্গে রিকশায় ঘোরার আনন্দের কোনো তুলনা নেই। কত মজার মজার কথা যে বাবা রিকশায় যেতে যেতে বলেন! হাসির কথা, জ্ঞানের কথা। কত রকম ধাঁধা, কত রকম অংক। একবার বাবা বললেন, টিয়া পাখি, দেখি তোর বুদ্ধি কেমন। কঠিন একটা ধাঁধা দিচ্ছি। হুট করে উত্তর দিতে হবে না। ভেবে-টেবে বলবি। ব্যাপারটা হলো শিকল নিয়ে। শিকল দি চেইন। সবাই চায় চেইন থেকে মুক্তি। চেইন খুলে যাওয়া মানে মুক্তি, আনন্দ। শুধু একটি ক্ষেত্রেই চেইন খুলে যাওয়া মানে বন্ধন। আটকা পড়ে যাওয়া। বল তো দেখি কোন ক্ষেত্রে?

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, রিকশার ক্ষেত্রে। রিকশার চেইন খুলে যাওয়া মানে রিকশা বন্ধ।

বাবা হৃষ্ট গলায় বললেন, তোর অসম্ভব বুদ্ধি তো রে মা। রানি ভিক্টোরিয়ার বুদ্ধিও তোর চেয়ে কম ছিল বলে আমার ধারণা। তুই বুদ্ধি পেয়েছিস তোর মা'র কাছ থেকে। আমার কাছ থেকে বুদ্ধি পেলে তোর সর্বনাশ হয়ে যেত।

আমি বললাম, তোমার বুদ্ধি কি কম নাকি বাবা?

কম মানে? আমার বুদ্ধি হচ্ছে সর্বনিম্ন পর্যায়ের। প্রায় চতুষ্পদীয় গোত্রের।

বাবাকে আমার খুব বুদ্ধিমান মনে হয়। একধরনের মানুষ আছে যারা নিজেদের অন্যের কাছে বোকা হিসেবে তুলে ধরতে ভালোবাসে। বাবা সে ধরনের। মানুষের এই অদ্ভুত স্বভাবের কারণ কী কে জানে! ইচ্ছে করে বাবা অন্যের সামনে বোকামি সব কাণ্ডকারখানা করে বসেন। যেমন ধরা যাক– মার কিছু বন্ধুবান্ধব এসেছেন। তাদের চা দেয়া হয়েছে। তারা চা খাচ্ছেন। গল্পগুজব করছেন। হাসাহাসি করছেন। তখন বাবা হুট করে ঘরে ঢুকবেন। তাঁর গায়ে থাকবে ময়লা একটা গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। সেই লুঙ্গি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে। তিনি ঘরে ঢুকে খুবই বিব্রত হওয়ার ভঙ্গি করবেন। মা অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন, কী ব্যাপার? বাবা আমতা আমতা করে বলবেন– দিলশাদ, খুব খিদে লেগেছে। আমাকে একটা ডিম ভেজে দাও তো, পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে ঝাল করে।

বাবার কথায় অতিথিরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবেন। মা'র ভুরু কুঁচকে যাবে। চোখের দৃষ্টি সরু হয়ে যাবে। বাবা অসহায়ের মতো সবার দিকে একবার করে তাকাবেন। অথচ কেউ বুঝবেন না বাবা এই কাণ্ড ইচ্ছে করে ঘটিয়েছেন। তাঁর খিদে পেলে তিনি ফুলির মাকে বলে ডিম ভেজে খেতে পারেন। তিনি তা না করে সবার সামনে মাকে বিব্রত করে একধরনের মজা পাচ্ছেন। এই ব্যাপারগুলো আমি বুঝি, মা বুঝেন না। এইজন্যেই মাকে আমার খুব বুদ্ধিমতী বলে মনে হয় না। বুদ্ধিমতী যে-কোনো মেয়ে এই ব্যাপারটা ধরে ফেলত।

সবাই বলে ছোট পরিবার সুখী পরিবার। রাস্তায় সাইনবোর্ডে লেখা থাকে। চিঠির উপর সিল মারা থাকে ছোট পরিবার যার, সুখের অন্ত নাই তার। আমাদের পরিবার ছোট

পরিবার। আমি, বাবা আর মা। না, ভুল বললাম, ফুলির মা আছে। সে আমার জন্মের আগে থেকে এ বাড়িতে আছে। কাজেই সেও তো পরিবারেরই একজন। তাকে নিয়ে আমরা চারজন। আমাদের খুব সুখী হবার কথা। আমরা বোধহয় সুখী না। বাবা-মা'র সম্পর্ক বরফের মতো। তারা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করেন। এমন কঠিন ঝগড়া! কত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া তা একটু বলি– আমাদের ফুলির মা'র সিগারেট খাওয়ার বিশ্রী অভ্যাস আছে। বাবার সিগারেটের প্যাকেট থেকে সে সিগারেট চুরি করে রাখে। অনেক রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আরাম করে খায়। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে স্যাৎ করে নাক দিয়ে সেই ধোয়া টেনে নেয়। আমি কয়েকবার দেখেছি। একদিন বাবা করলেন কী তাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে এনে দিয়ে বললেন, চুরি করার দরকার নেই। এই প্যাকেটটা রাখ। শেষ হলে বলবে, আবার এনে দেব। মা এটা শুনে হৈচৈ শুরু করলেন। আর ফুলির মা শুরু করল কান্না। ব্যাপারটা এখানে শেষ হয়ে যেতে পারত, শেষ হলো না। রাত দুটার সময় মা বাবাকে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার বাস করা সম্ভব না। তুমি চলে যাও। বাবা বললেন, রাত দু'টার সময় আমি কোথায় যাব?

তুমি যদি না যাও আমি আমার মেয়েকে নিয়ে চলে যাব।

ঠিক আছে আমিই যাচ্ছি, তবে আপাতত বসার ঘরের সোফায় শুয়ে থাকছি। ভোর বেলা চা খেয়ে চলে যাব।

তুমি এখনি যাবে।

বাবাকে রাত দুটার সময়েই চলে যেতে হলো। তবে তার জন্যে তাঁকে খুব দুঃখিত বলেও মনে হলো না। এই ঘটনা থেকে মনে হতে পারে মা'র দোষই বেশি। আসলে তা না। বাবা

মাকে রাগিয়ে দেবার জন্যে যা যা করা দরকার সবই করেন। খুব গুছিয়ে করেন। মাকে রাগিয়ে তিনি কী আনন্দ পান তিনিই জানেন।

সাপ মা'র খুব অপছন্দের প্রাণী। সাপের নাম শুনলেই তিনি শিউরে ওঠেন। কোনোদিন যদি মা কোনো সাপের ছবি দেখেন তাহলে সেদিন তিনি কিছু খেতে পারেন না। এইসব জেনেশুনেও বাবা একবার সাপুড়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা সাপ কিনে নিয়ে এলেন। ছোট্ট একটা কাঠের বাক্সে সাপটা ভরা। বাক্সের ডালায় সাপের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে একটি ফুটো। মা বললেন, বাক্সে কী? বাবা হাই তুলতে তুলতে বললেন, নাথিং। অ্যাবসুলিউটলি নাথিং।

নাথিং মানে কী?

একটা সাপ কিনলাম।

মা চমকে উঠে বললেন, কী কিনলে?

সাপ। সরীসৃপ। আমার অনেক দিনের শখ।

মা আতঙ্কে শিউরে উঠে বললেন, তোমার অনেক দিনের শখ সাপ কেনা?

হুঁ।

তোমার এই শখের কথা তো কোনোদিন শুনি নি।

তুমি সাপ ভয় পাও এইজন্যে বলা হয় নি। এখন যেহেতু সাপ পুষব দেখবে তোমার ভয় কেটে যাবে। এক ঢিলে দুই পাখি। আমার শখ মিটল, তোমার ভয় কাটল।

তুমি এই সাপ পুষবে?

অবশ্যই। সাপ পোষা অত্যন্ত সহজ। খাওয়ার খরচ নেই বললেই হয়। সপ্তাহে একটা ইঁদুর। লোকে যে বলে সাপ দুধ খায়, কলা খায় সবই ফালতু কথা। দুধ চুমুক দিয়ে খেতে ফুসফুস লাগে। সাপের ফুসফুস নেই। কলা খাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। সাপ তো আর বাদর না যে কলা খাবে।

সাপ অবশ্যি শেষপর্যন্ত পোষা হয় নি। বাবাকে কাঠের বাক্সসদ্ধ ফেলে দিয়ে আসতে হয়েছে। বাবাও জানতেন ফেলা হবে। পুরো ব্যাপারটা তিনি করেছেন মাকে কিছু যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে। যন্ত্রণা দেয়া গেছে এতেই তিনি খুশি। পঞ্চাশ টাকায় সাপ কেনা তার সার্থক। পঞ্চাশ টাকায় এতটা আনন্দ পাবেন তা বোধহয় বাবা নিজেও ভাবেন নি। তার আনন্দিত মুখের ছবি এখনো আমার চোখে ভাসে।

.

বাবা অনেক দিন হলো আমাদের সঙ্গে থাকেন না। থাকেন পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবনে। কাঠের ব্যবসা করেন। কাঠের ব্যবসা যারা করে তারা ক্রমাগত ধনী হয়, বাবা শুধুই গরিব হন। মা'র ধারণা, ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু না। ব্যবসার অজুহাতে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকা, নিরিবিলিতে মদ খাওয়া। মার ধারণা সত্যি হতেও পারে।

নেশা করার কুৎসিত অভ্যাস বাবার আছে। খুব প্রবলভাবেই আছে। যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে। তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। গালটাল ভেঙে কী বিশ্রী যে তাকে দেখায়! অথচ যৌবনে বাবা কী সুন্দরই না ছিলেন! বিয়ের পর তোলা বাবা ও মা'র একটা বাধানো ছবি মা'র শোবার ঘরে আছে (এখন নেই। মা সেই ছবি সরিয়ে ফেলেছে)। সেই ছবিতে বাবাকে দেখায় রাজপুত্রের মতো। মা অসম্ভব রূপবতী, তারপরেও বাবার পাশে মানায় না। রাজপুত্রের পাশে রাজকন্যার মতো লাগে না। রাজপুত্রের পাশে মন্ত্রিকন্যার মতো লাগে।

মা'র যখন বিয়ে হয় তখন বাবা বিদেশী এক ওষুধ কোম্পানির প্রোডাকশান ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর ছিল টকটকে লাল রঙের একটা মরিস মাইনর গাড়ি। গাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি লাল টাই পরতেন। মাকে পাশে বসিয়ে খুব ঘুরতেন। বিয়ের একবছরের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিলেন– তাঁর নাকি বোরিং লাগছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নিলেন। সেই চাকরি বছর দুই করার পর তাও তার কাছে বোরিং লাগতে লাগল। প্রাইভেট কলেজে কিছুদিন মাস্টারি করলেন। সেটাও ভালো লাগল না। ব্যবসা শুরু করলেন। ব্যবসার শুরুটা খুব ভালো ছিল। ব্যবসা করতে গিয়েই মদ খাওয়ার অভ্যাস হলো। কাজ বাগাবার জন্যে নানান পার্টিতে নাকি যেতে হয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একটু-আধটু খেতে হয়। জীবনের কোনো কিছুই তার দীর্ঘদিন ভালো লাগে নি, মদ খাওয়া ভালো লেগে গেল। মদ খাওয়াটা ছাড়তে পারলেন না। সংসারে অশান্তির সীমা রইল না। অশান্তি শেষ হলো যেদিন বাবা বললেন, দিলশাদ, কাঠের ব্যবসা করব বলে ঠিক করেছি। বান্দরবন চলে যাব। কাঠ কেটে হাতি দিয়ে নামানো। খুবই লাভের ব্যবসা। মা কঠিন গলায় বললেন, তোমরা যা ইচ্ছা কর। কাঠ হাতি দিয়ে টেনে নামাও বা নিজেই টেনে নামাও আমার কিছু যায় আসে না।

তোমাদের ছেড়ে বাইরে থাকতে হবে।

দয়া করে তাই থাক।

কোনোরকম চিন্তা করবে না, প্রতিমাসে খরচ পাঠাব।

তোমাকে কোনো খরচ পাঠাতে হবে না। দয়া করে তুমি ঢাকায় এসো না। তাহলেই আমি খুশি হব।

তোমার যে চাকরি তাতে তো আর বাড়িভাড়া দিয়ে সংসার চালাতে পারবে না।

সেটা আমি দেখব।

তুমি বরং এই অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে ভালো কোনো অ্যাপার্টমেন্ট নাও, যেখানে সিকিউরিটি সিস্টেম ভালো। একা একা থাকবে...।

আমাদের নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

বাবা চলে যাবার দিনও বেশ খারাপ ব্যবহার করলেন। সেলাই মেশিন দিয়ে জানালার পর্দা সেলাই করছিলেন। বাবা স্যুটকেস হাতে নিয়ে বললেন, যাই। মা সেলাই করতে করতে বললেন, আচ্ছা। মা ফিরে তাকালেন না বা উঠে দাঁড়ালেন না। বাবা আবার বললেন, যাচ্ছি তাহলে, কেমন?

মা বললেন, আচ্ছা।

চিঠি দিও। আমি পৌঁছেই ঠিকানা জানিয়ে দেব।

মা জবাব দিলেন না। সেলাই মেশিন চালাতে লাগলেন। ঘরঘর শব্দ হতে লাগল। বাবা বিষণ্ণ মুখে দরজার দিকে যাচ্ছেন। তাকে খুব লজ্জিত মনে হচ্ছিল। আমি তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। তিনি মাথা নিচু করে হাঁটছেন, মনে হচ্ছে আমাকে চিনতেও পারছেন না। রিকশায় ওঠার সময় আমি বললাম, প্রতি সপ্তাহে চিঠি দিও বাবা। তিনি বললেন, হুঁ হুঁ।

সেই রাতেই আমার প্রথম মাথায় যন্ত্রণা হলো। টিভিতে নাচের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল। নজরুলগীতির সঙ্গে নাচ। গানটা খুব সুন্দর, নাচটাও সুন্দর হচ্ছিল। স্টুডিওতে নকল একটা নদী বানিয়েছে। সেই নদীতে চাঁদের আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। বোঝা যাচ্ছে নকল, তারপরেও ভালো লাগছে। এই সময় হঠাৎ আমার কাছে সবকিছু ঝাঁপসা লাগতে লাগল। প্রথম ভাবলাম ইলেকট্রিসিটির ভোল্টেজে কিছু হয়েছে। তারপর দেখি ঘরবাড়ি দুলছে। আমি ভয় পেয়ে ডাকলাম, মা মা! মা ছুটে এলেন আর তখনি তীব্র যন্ত্রণায় মাথাটা ফেটে যাবার মতো হলো। আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি পড়ে যাচ্ছি। মা এসে আমাকে ধরে ফেললেন। আর তখনি ব্যথা কমে সব স্বাভাবিক হয়ে গেল।

মা ভাবলেন, বাবা চলে গেছেন এইজন্যেই আমার মাথার যন্ত্রণা হয়েছে। আমি কিন্তু পরিষ্কার বুঝলাম বাবার যাওয়া না-যাওয়া না– এই ব্যথা সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমার খুব ভয় ভয় করতে লাগল। রাতে মাকে বললাম, মা, আমি তোমার সঙ্গে ঘুমুব।

অনেক দিন পর মা'র সঙ্গে শুয়েছি। মা আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, বাবা চলে যাবার জন্যে মনটা খুব খারাপ, তাই না?

আমি বললাম, হুঁ।

তুই তোর বাবাকে কি আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসিস?

হুঁ।

তাকে কতটা বেশি ভালোবাসিস? সামান্য বেশি না অনেকখানি?

অনেকখানি।

আমাকে তোর ভালো লাগে না?

ভালো লাগে না তা তো বলি নি। ভালো লাগে, তবে বাবার চেয়ে অনেক কম ভালো লাগে।

এই যে তোর বাবা প্রতিরাতে নেশা করে বাসায় ফেরে, নেশার ঘোরে হৈচৈ চিৎকার করে, সংসারের কোনো কিছু দেখে না তারপরেও তাকে ভালো লাগে?

হুঁ।

সূচিপত্র

মা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে তো স্বীকার করতেই হয় তোর বাবা খুব ভাগ্যবান। এরকম জীবনযাপন করার পরও ছেলেমেয়ের ভালোবাসা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সবার ভাগ্যে এটা হয় না।

আমি বললাম, তোমাকেও আমি খুব ভালোবাসি মা বাবার জন্যে ভালোবাসা একরকম আর তোমার জন্যে ভালোবাসা অন্যরকম।

সেটা কী বুঝিয়ে বল।

বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আচ্ছা থাক, বলতে না পারলে বলতে হবে না। ঘুমো।

.

আমার মা খুব গোছানো স্বভাবের মেয়ে। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এলোমেলো কিছুই তার পছন্দ না। সামান্য একটা শাড়ি যখন ঘরে পরেন তখন এমন গুছিয়ে পরেন, মনে হবে সেজেগুঁজে আছেন– এক্ষুনি কোথাও বেড়াতে বের হবেন। কাউকে যখন কাঁচের গ্লাসে পানি দেবেন সেই গ্লাস ঝকঝক করবে। একবার পানি খাবার পর আবার পানি খেতে ইচ্ছা করবে। মাকে আমার অনেকের চেয়েই আলাদা মনে হয়। মার অন্য দুই বোন– আমার বড় খালা আর মেজোখালার সঙ্গে তার কোনোরকম মিল নেই। অথচ তারা তিনজনই দেখতে একরকম। গলার স্বরও একরকম। বড় খালা ও মেজোখালা দুজনের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই হলো শপিং সেন্টারে ঘোরাঘুরি করা। বড়খালা

সবসময়ই কিছু না কিছু কিনছেন। মেজোখালা দেখে বেড়াচ্ছেন। কিনছেন না, দরদাম করছেন। তাদের সমস্ত কথাবার্তাই কেনাকাটা নিয়ে। বড়খালা হয়তো এলেন, তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে হাঁপিয়ে গেলেন। তাঁর ভারি শরীর, তিনি অল্পতেই হাঁপিয়ে যান। ঘরে ঢুকেই বলবেন, ও দিলশাদ, ঠাণ্ডা পানি দে। মরে গেলাম রে। তাঁকে পানি দেয়া হলো। গ্লাসের দিকে তাকিয়েই বললেন– গুলশানের একটা দোকানে গ্লাসের একটা সেট দেখলাম। অসাধারণ। সোনালি কাজ করা। খুব হালকা কাজ। ছোট ছোট পাতা। গ্লাসে পানি ভরলে গ্লাসটা দেখা যায় না, পানিও দেখা যায় না। শুধু সোনালি কাজগুলি দেখা যায়।

মা এ জাতীয় কথায় অংশগ্রহণ করেন না। চুপচাপ বসে থাকেন। তার চোখের দৃষ্টিতে আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই থাকে না। বড়খালার তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি কথা বলতেই থাকেন।

মেড ইন জাপান, বুঝলি। জাপানিরা এরকম গ্লাস বানাবে ভাবাই যায় না। দুটা সেট ছিল, একটা কিনলাম। দাম কত বল তো? তোর অনুমান দেখি।

আমার অনুমান ভালো না।

আহা, তবু একটা অনুমান কর না।

এক হাজার টাকা।

তোর কি মাথাটা খারাপ নাকি? এক হাজার টাকা তো সাধারণ একটা গ্লাস সেট কিনতেই লাগে। ঐ দিন জার্মানির কাট গ্লাসের একটা সেট কিনলাম, আট পিসের সেট। দাম পড়ল ন হাজার টাকা। তোর দুলাভাই খুব রাগ করছিল। রাগ করলে লাভ হবে? এরকম জিনিস কি সবসময় পাওয়া যায়? হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়। এইজন্যে সবসময় চোখ-কান খোলা রেখে বাজারে ঘুরতে হয়। ভালো জিনিস কখনো পড়ে থাকে না। কেউ দেখল, ফট করে নিয়ে নিল।

বড় খালার দীর্ঘ গল্প কী যে বিরক্তিকর! একনাগাড়ে এই গল্প শুনলে যে-কেউ ঘুমিয়ে পড়বে। বড়খালা আমার মা হলে গুলশান-বনানী নিউমার্কেটের দোকানগুলির সব জিনিসপত্রের দাম আমার মুখস্থ থাকত। তিনি হয়তো পাঁচশ পাতার একটা খাতা আমাকে বানিয়ে দিতেন। সেই খাতায় আমাকে সব জিনিসপত্রের দাম লিখে রাখতে হতো। কে জানে, তখন হয়তো আমাকেও তার সঙ্গে দোকানে দোকানে ঘুরতে হতো।

মেজোখালা ভয়ঙ্কর কৃপণ বলেই কিছু কেনেন না। শুধু দেখেন। তিনি গল্প রেন অন্য বিষয় নিয়ে। তার গল্প হলো কে কে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সেই গল্প। মেজোখালার ধারণা, তিনি এই পৃথিবীর সবচে' রূপবতী মেয়ে এবং তাঁর চোখে আছে অসম্ভব আকর্ষণী ক্ষমতা। যে পুরুষ একবার তার চোখের দিকে ভালোমতো তাকাবে সে সারাজীবনের জন্যে আটকা পড়ে যাবে। মেজোখালা খুব বুদ্ধিমতী। কিন্তু এত বুদ্ধিমতী একজন মহিলা এমন বোকার মতো একটা ধারণা নিয়ে বাস করেন কীভাবে কে জানে। তবে মেজোখালা গল্প করেন খুব সুন্দর করে। গলার স্বর নিচু করে, হাত নেড়ে, চোখ বড় বড় করে সুন্দর বর্ণনা। শুনতে খুব ভালো লাগে।

বুঝলি দিলশাদ, কী কাণ্ড হয়েছে শোন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোহাগ কম্যুনিটি সেন্টারের ঘটনা। চন্দনার বিয়েতে গিয়েছি। চন্দনাকে চিনেছিস তো? ঐ যে ব্রিগেডিয়ার লতিফের মেজো মেয়ে। আমি পরেছি একটা কাঞ্জিভরম শাড়ি, বিসকিট কালারের জমিন, মেজেন্টা পাড়। একদিকে মেজেন্টা, অন্যদিকে সবুজ। খাওয়া-দাওয়ার পর আমি পান নিচ্ছি, হঠাৎ সাফারি পরা এক ভদ্রলোক এসে বললেন, ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি কি শুনবেন? আপনার কাছে হাতজোড় করছি। আমি বললাম, বলুন।

এখানে খুব ভিড়। আপনি যদি গেটের কাছে একটু আসেন। জাস্ট ফর এ সেকেন্ড।

এমন করে বলছে না গেলে খারাপ দেখা যায়। আমি গেলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে। তারপর যা হলো সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। থাক, নাতাশার সামনে বলব না। সে আবার চোখ বড় বড় করে শুনছে। আয় দিলশাদ, অন্যঘরে যাই।

আমার দুই খালারই অনেক টাকা। ঢাকা শহরে তাঁদের দুটা-তিনটা করে বাড়ি আছে। তাঁরা কেউ গাড়ি ছাড়া বের হতে পারেন না। ঈদের বাজার করতে কোলকাতা যান। শুধু আমার মা গরিব। এখন তিনি এনজিও'র কী একটা চাকরি করেন। বড় একটা গাড়ি এসে তাঁকে নিয়ে যায়। অনেক পোজপাজ, কিন্তু বেতন কম। যা বেতন পান তার অনেকটাই চলে যায় বাড়িভাড়ায়, বাকি টাকাগুলি তাকে খুব সাবধানে খরচ করতে হয়। বুয়া কতটুকু চাল সিদ্ধ করবে তা পর্যন্ত মা মেপে দেন। বুয়া নিজে নিজে চাল নিলে বেশি নিয়ে ফেলতে পারে। মাঝে মাঝে মা'র অসময়ে চা খেতে ইচ্ছা করে। তিনি খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে বলেন, একটু চা কর তো ফুলির মা। তারপরেই সম্ভবত তার মনে হয় এটা বাড়তি খরচ।

অসময়ের চায়ে বাড়তি চিনি লাগবে, দুধ লাগবে। হিসেবের চিনি দুধে টান পড়বে। মা হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বিষণ্ন গলায় বলেন, থাক, লাগবে না। এই সময় আমি একটা কাণ্ড কার। আমি বলি, আমারও খুব চা খেতে ইচ্ছা করছে মা। বুয়াকে তোমার জন্যে চা করতে বলো। আমি তোমার কাপ থেকে দুচুমুক খাব। আমাকে দুচুমুক খেতে দেয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে মাকে চা খেতে হয়। সেই চা তিনি বেশ আয়োজন করে খান। মা'র চা খাওয়া পর্বটা বেশ মজার। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসেন। চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার আগে খুব সাবধানে ঠোঁট আগিয়ে আনেন। যেন চাটা ভয়ঙ্কর গরম। ঠোঁট লাগানো মাত্র পুড়ে যাবে। কয়েক চুমুক চা খাওয়ার পর মা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তখন তাকে দেখে মনে হয় তিনি এই জগতে নেই। ভিন্ন কোনো জগতে বাস করছেন। সেই জগতের সঙ্গে এই পৃথিবীর কোনো মিল নেই। তখন যদি দরজার কড়া নড়ে মা শুনতে পান না।

একবার মা এরকম অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। তখন ফুলির মা একটা প্লেট ভেঙে ফেলল। ঝন ঝন শব্দ হলো। মা সেই শব্দও শুনতে পেলেন না। অথচ আমাদের বাসায় কাপ-পিরিচ ভাঙা ভয়াবহ ঘটনা। অন্যমনস্ক অবস্থায় মা কী ভাবেন আমার জানতে ইচ্ছা করে। প্রায়ই ভাবি জিজ্ঞেস করব। তারপর আর জিজ্ঞেস করা হয় না। এখন রিকশায় করে মা'র সঙ্গে ফিরছি। মা ডানহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। তার গা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে। হালকা গন্ধ। যে গন্ধ শুধু মাদের শরীরেই থাকে এবং মাদের সন্তান ছাড়া আর কেউ সেই গন্ধ পায় না। আমি ডাকলাম, মা। মা জবাব দিলেন না। তিনি এখন ডুবে গেছেন তার সেই বিখ্যাত অন্যমনস্কতায়। মা'র তাকানোর ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমার কোনো কথাই এখন তার কানে ঢুকবে না। রাস্তার গর্তে পড়ে রিকশা বড় একটা ঝাঁকুনি খেল। মা'র অন্যমনস্কতা কেটে গেল। মা ফিসফিস করে বললেন, নাতাশা!

হুঁ।

তুই তোর অসুখ নিয়ে কোনোরকম চিন্তা করবি না।

চিন্তা করছি না তো।

ডাক্তারদের ধারণা, তোর মাথায় ছোট্ট মটরদানার মতো একটা টিউমার হয়েছে। বেনাইন টিউমার। বেনাইন টিউমার কাকে বলে জানিস?

না।

বেনাইন হলো যে টিউমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

ও।

ডাক্তার অপারেশন করে ঐ টিউমার সরিয়ে ফেলবেন। সেই অপারেশনও খুব সহজ অপারেশন। আমাদের দেশে হচ্ছে না, তবে বিদেশে হরদম হচ্ছে। তোর অপারেশন আমি বিদেশে করাব।

এত টাকা কোথায় পাব?

সেটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। যেভাবেই হোক আমি জোগাড় করব।

কত টাকা লাগবে?

তাও তোর জানার দরকার নেই। তুই শুধু মনে সাহস রাখবি। তোর মনে সাহস আছে তো?

হুঁ, আছে।

সাহস খুব বড় একটা গুণ। এই গুণ পশুদের অনেক বেশি। মানুষের কম। কেন কম বল তো?

মানুষ বুদ্ধিমান, এইজন্যেই মানুষের সাহস কম। বুদ্ধিমানরা সাহসী হয় না।

মা আমার কথায় চমকে গিয়ে আমার দিকে তাকালেন। এরকম কথা তিনি মনে হয় আমার কাছ থেকে আশা করেন নি। মা আরো শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। নরম গলায় ডাকলেন, নাতাশা!

উঁ।

তুই কি তোর বাবাকে অসুখের কথা কিছু লিখেছিস?

না।

তোর কিছু লেখার দরকার নেই। যা লেখার আমিই লিখব।

আচ্ছা।

রিকশায় করে আরো কিছুক্ষণ ঘুরবি?

আজ আমার রিকশায় ঘুরতে ভালো লাগছে না। খুব ক্লান্তি লাগছে। মনে হচ্ছে রিকশার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ব, তবু বললাম, হুঁ ঘুরব।

তুই আর তোর বাবা রিকশা চড়ায় ওস্তাদ। ঠিক বলি নি?

হুঁ।

তোর ঘুরতে ভালো লাগছে?

লাগছে। রিকশার হুড ফেলে দাও।

না, হুড ফেলা যাবে না। গায়ে রোদ লাগবে।

আমি চোখের পাতা মেলে রাখতে পারছি না। হঠাৎ করে রাজ্যের ঘম আমার চোখে নেমে এসেছে। আমি মার কাছে ঘেঁসে এলাম। তার শরীরের গন্ধ এখন আরো তীব্র হয়েছে। পরিচিত কোনো ফুলের গন্ধের সঙ্গে এই গন্ধের মিল আছে। কী ফুল তা মনে করতে পারছি না। মা বললেন, কী রে, তোর শরীর খারাপ লাগছে নাকি? তুই এরকম করছিস কেন?

আমি জবাব দিলাম না। চেষ্টা করলাম আরো মার কাছে ঘেসে আসতে। সেটা সম্ভব না। কারোরই খুব বেশি কাছাকাছি যাওয়া যায় না। কথাটা কে যেন বলেছিল? বাবা বলেছিল? মনে হয়, বাবা।

এরকম অদ্ভুত আর মজার মজার কথা বাবা ছাড়া কে বলবে? বাবার কথাটা কি সত্যি? যদি সত্যি হয় তাহলে হাজার চেষ্টা করেও বাবা মার খুব কাছে যেতে পারবেন না, আবার মাও বাবার খুব কাছে যেতে পারবেন না।

তবে আমার মনে হয়, কথাটা সত্যি না। ইচ্ছে করলেই মানুষের খুব কাছে যাওয়া যায়। সেই ইচ্ছেটাই কেউ করে না। ‘ আমি বেঁচে থাকলে করতাম। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হতো, আমি খুব চেষ্টা করতাম তার কাছাকাছি যেতে। সে খারাপ ধরনের মানুষ হলেও করতাম। সে বাইরে থেকে ঘরে এলে আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে তার দিকে তাকিয়ে হাসতাম। মা'র মতো চোখ-মুখ শক্ত করে থাকতাম না। সে ঘরে ঢোকামাত্র আমি তার হাত ধরে বলতাম–আজ সারাদিন কী কী করলে বলো তো। সে হয়তো বিরক্ত গলায় বলত, আহা, কী শুরু করলে! হাত-মুখটা ধুতে দাও। আমি বলতাম, আগে বলতে হবে সারাদিন কী করলে, তারপর তোমাকে ছাড়ব।

আচ্ছা, আমি বোধহয় একটু খারাপ হয়ে গেছি। এখন প্রায়ই বিয়ের কথা ভাবি। এই বয়সে কোনো মেয়ে নিশ্চয়ই বিয়ের কথা ভাবে না। মনে হয় দিন-রাত বিছানায় শুয়ে থাকার জন্যে এটা হয়েছে। কিছু করার নেই, শুয়ে শুয়ে থাকা। বাংলা আপা একবার বলেছিলেন, ‘অলস মস্তিষ্ক শয়তানের ক্রীড়াভূমি।’ আমার অলস মস্তিষ্ক শয়তানের খেলার মাঠ হয়ে গেছে। কয়েকদিন আগে আবার রাতে বিয়ের স্বপ্ন দেখে ফেললাম। রোগা কালো একটা

ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। ছেলেটা রোগা এবং কালো হলেও তার চোখ খুব সুন্দর। আর খুব হাসতেও পারে– সারাক্ষণ হাসছে। আমি তাকে বললাম, এই শোন, এত মেয়ে থাকতে তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন? তুমি কি জানো না– আমি বাঁচব না? আমার ব্রেইন টিউমার হয়েছে। মেনিনজিওমা।

ছেলেটা সেই কথা শুনে আরো হাসতে লাগল। তারপর বলল, ঠাট্টা করবে না তো। অসুখ-বিসুখ নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই। ঠাট্টা করলে সত্যি সত্যি অসুখ হবে।

আমি বললাম, ঠাট্টা করছি না। তুমি মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

এতে সে মজা পেয়ে আরো হাসতে লাগল। আমি তখন রেগে গিয়ে বললাম, খবরদার, হাসবে না।

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, তাহলে কি আমি কাঁদব? বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। তার কান্না দেখে আমার এত খারাপ লাগল যে আমিও কাঁদতে লাগলাম।

তখন মা এসে ধাক্কা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, নাতাশা, কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?

আমি আমার সব কথা মাকে বলি– স্বপ্নের কথাটা মাকে বলতে পারলাম না। এমন লজ্জা লাগল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আচ্ছা, এইজন্যেই কি একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের খুব কাছে যেতে পারে না? লজ্জা, দ্বিধা, ভয় একজন মানুষকে অন্য একজন মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে? খুব ঘনিষ্ঠ দুজন মানুষের মাঝখানেও বোধহয় পর্দা থাকে। কারো পর্দা খুব ভারী, কারোটা আবার হালকা স্বচ্ছ মসলিনের। সব দেখা যায় তারপরেও অনেক কিছুই দেখা যায় না।

২. টেলিফোনের শব্দে

টেলিফোনের শব্দে দিলশাদ জেগে উঠল। অনেক রাত, ঘর অন্ধকার। মাথার কাছে দেয়ালঘড়ি টিক টিক করছে। বেশ বাতাস। বাতাসে জানালার পর্দা নড়ছে। চারপাশের পৃথিবী পরিচিত, শব্দাবলি পরিচিত। কিন্তু যে টেলিফোনের শব্দ ঘুম ভাঙাল সেই টেলিফোন এলো কোত্থেকে? এ বাসায় টেলিফোন নেই। কখনো ছিল না। সাজ্জাদের যখন দিনকাল ভালো ছিল তখনো না। সাজ্জাদ টেলিফোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করেছিল, লাইন আসে নি। কে জানে এতদিনে হয়তো এসেছে। পুরনো বাড়িতে টেলিফোন মিস্ত্রিরা ঘোরাঘুরি করছে।

তাহলে ঘুমের মধ্যে টেলিফোনের পরিষ্কার আওয়াজ সে শুনল কীভাবে? শুধু যে ঘুমের মধ্যে শুনেছে তা না। ঘুম ভাঙার পরেও শুনেছে টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে। আশ্চর্য তো! তাহলে কি কলিংবেলের আওয়াজ? এ বাসায় কলিংবেল আছে, তার শব্দও টেলিফোন রিং-এর কাছাকাছি। তবে গত দুদিন ধরে সেই কলিংবেল নষ্ট। ফ্ল্যাট বাড়ির কেয়ারটেকার ত্রিশ টাকা নিয়ে গেছে কলিংবেল ঠিক করার জন্যে, এখনো ঠিক হয় নি।

দিলশাদ বিছানা থেকে নামল। বাতি জ্বালাল না। বেশিরভাগ মানুষ রাতে ঘুম ভাঙলে প্রথম যে কাজটি করে তা হচ্ছে বাতি জ্বালানো। হুড়মুড় করে ছুটে যায় সুইচ বোর্ডের দিকে। যেন এই মুহূর্তে সুইচ না টিপলে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে। দিলশাদের ব্যাপারটা অন্যরকম। সে রাতে ঘুম থেকে উঠে কখনোই বাতি জ্বালায় না। পানির পিপাসা পেলে অন্ধকারেই খাবার টেবিলের দিকে যায়। খাবার টেবিলে পিরিচে ঢাকা জগ থাকে, গ্লাস থাকে। দিলশাদের অন্ধকারে চলাচল করতে অসুবিধা হয় না। তাছাড়া রাতে এই ফ্ল্যাট কখনো

পুরোপুরি অন্ধকার হয় না। ফ্ল্যাটের বারান্দায় চল্লিশ পাওয়ারের একটা বাতি সারারাত জ্বলে। বড় রাস্তার পাশে ফ্ল্যাট। রাস্তার হলুদ সোডিয়াম লাইটের আলোও ঘরে ঢোকে।

সাজ্জাদের ধারণা, পুরোপুরি অন্ধকার দেখতে হলে জঙ্গলে যেতে হবে। সত্যিকার অন্ধকার শুধু জঙ্গলেই দেখা যায়। দিলশাদ ঠিক করে রেখেছে নাতাশার চিকিৎসার জন্যে বাইরে যাবার আগে দুদিনের জন্যে হলেও সাজ্জাদের সেই বিখ্যাত জঙ্গল দেখে আসবে। তার নিজের জন্যে নয়, জঙ্গল দেখা বা সত্যিকারের অন্ধকার দেখার শখ তার নেই। নাতাশার জন্যে যেতে হবে। নাতাশা তার বাবার জঙ্গল দেখার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সেই অপেক্ষার ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছে না। এই মেয়ের সবকিছুই গোপন। নিজ থেকে সে কখনোই বলবে না তার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তার শারীরিক সুবিধা-অসুবিধার কথা জানার কোনো উপায় নেই। দিলশাদের ধারণা, এখন নাতাশার চোখের সমস্যা হচ্ছে। বই পড়ার সময় বই চোখের খুব কাছে নিয়ে আসছে। বেশিক্ষণ পড়ছেও না। মনে হয় পড়তেও কষ্ট হচ্ছে। আগে মাঝে মাঝে দেখা যেত খাটের পাশের টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে সে তার খাতায় রাত জেগে লেখালেখি করছে। এখন তাও করে না।

দিলশাদ মেয়ের ঘরে ঢুকল। নাতাশা হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। খাটের একপাশ দেয়ালের সঙ্গে লাগানো, অন্যপাশে দুটি চেয়ার দেয়া। এই ঘরে জিরো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। জিরো পাওয়ারের আলো চাঁদের আলোর কাছাকাছি। শুধু চাঁদের আলোয় রহস্য আছে, এই আলোয় রহস্য নেই।

নাতাশা ঘুমুচ্ছে। তার গায়ে পাতলা একটা চাঁদর। কোলবালিশের উপর তার রোগা একটা হাত। কোলবালিশ নাতাশার পছন্দ না, তবু রোজ রাতে দিলশাদ কোলবালিশটা এনে

বিছানায় দিয়ে যায়। খাটের পাশে চেয়ার দিয়ে দেয়াল তোলাও নাতাশার অপছন্দ। সে আহত গলায় বলে, তুমি চেয়ার দাও কেন মা? তোমার কি ধারণা আমি গড়িয়ে পড়ে যাব? চেয়ার সরিয়ে নাও তো, আমার বন্দি বন্দি লাগে। নাতাশার খুব অপছন্দের এই কাজটিও দিলশাদ করে। অনেক অপ্রিয় কাজ মাদের করতে হয়।

নাতাশার ঘরে পা দিয়েই দিলশাদের মনে হলো নাতাশা ঘুমুচ্ছে না, জেগে আছে। এরকম মনে হবার যদিও কোনো কারণ নেই। ঐ তো দেখা যাচ্ছে নাতাশার চোখ বন্ধ। ঘুমন্ত মানুষের মতো ধীর লয়ে তার নিঃশ্বাস পড়ছে।

দিলশাদ নরম গলায় ডাকল, নাতাশা! এই বুড়ি!

নাতাশা জবাব দিল না। অথচ দিলশাদ মোটামুটি নিশ্চিত ছিল নাতাশা চোখ মেলে বলবে, কী?

দিলশাদ খাবার ঘরের দিকে গেল। তার পানির পিপাসা হচ্ছে। খাবার টেবিলে পানির জগ-গ্লাস নেই। ফুলির মা আজকাল কাজকর্ম ঠিকমতো করছে না। রুটিন কাজে প্রায়ই ভুল করছে। তিনজন মানুষের সংসারে এরকম হবে কেন? দিলশাদ বাতি জ্বালাল। ফ্রিজের ভেতর থেকে পানির বোতল বের করল। পানি ঠাণ্ডা হয় নি। ফ্রিজে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। গ্যাস ফুরিয়ে গেছে বা অন্য কিছু হয়েছে। পানি ঠাণ্ডা হয় না। ফ্রিজ ঠিক করার সামর্থ্য এখন দিলশাদের নেই। প্রতিটি পয়সা এখন তার কাছে সোনার টুকরোর মতো। তবে ফ্রিজটা ঠিক করতে হবে। নাতাশা ঠাণ্ডা পানি খেতে ভালোবাসে। তৃষ্ণা পেলেই বলবে, মা, ঠাণ্ডা পানি দাও তো।

খাবার ঘরের চেয়ারে দিলশাদ কিছুক্ষণ বসে রইল। বসে থাকতে ভালো লাগছে, তবে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। খুব মশা। এক্ষুনি মশা তাকে হেঁকে ধরবে। দিলশাদ আবার নাতাশার ঘরে ঢুকল। আশ্চর্য, মেয়ে চুপচাপ খাটে বসে আছে। দিলশাদ বলল, ব্যাপার কী রে? নাতাশা লজ্জিত গলায় বলল, কিছু না।

আমি যখন তোকে ডাকলাম তখন তুই কি জেগে ছিলি?

হুঁ।

জবাব দিস নি কেন?

এমনি।

পানি খাবি?

না।

দিলশাদ খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বসল। নাতাশার গায়ে কি জ্বর আছে? কিছুদিন হলো রাত করে জ্বর আসছে। বেশ ভালো জ্বর। দিলশাদ বলল, গা গরম নাকি রে মা?

উঁহু।

মেয়ের কথা দিলশাদের বিশ্বাস হলো না। সে মশারির ভেতর হাত ঢুকিয়ে মেয়ের গায়ের তাপ দেখল। জ্বর নেই, গা ঠাণ্ডা। একটু কি বেশি ঠাণ্ডা? শরীর কেমন হিম হয়ে আছে।

মাথার যন্ত্রণা নেই তো মা?

উঁহু।

মশারির ভেতর মশা ঢুকে নি তো?

দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে। দিলশাদের উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু নাতাশার বোধহয় বিশ্রাম দরকার।

নাতাশা!

উঁ।

আচ্ছা, তুই কি টেলিফোনের শব্দ শুনেছিস?

না তো!

আমি শুনলাম টেলিফোন বাজছে।

ঘুমের মধ্যে শুনেছ।

তাই হবে, কিন্তু এত স্পষ্ট শুনলাম।

মাঝে মাঝে স্বপ্ন খুব স্পষ্ট হয়। আমি আজকাল প্রায়ই একটা খুব স্পষ্ট স্বপ্ন দেখি।

দিলশাদ আগ্রহের সঙ্গে বলল, কী দেখিস?

নাতাশা শব্দ করে হাসল। দিলশাদ হাসি শুনেই বুঝল এই মেয়ে আর কিছু বলবে না। এই প্রশ্ন আবার করলে সে আবারো হাসবে। দিলশাদ মশারির ভেতর ঢুকে গেল। নিজের ঘরে এখন আর তার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। নাতাশার পাশে শুয়ে পড়লেই হবে। বালিশ নেই। বালিশ আনতে নিজের ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না।

নাতাশা!

উ।

তোর সঙ্গে ঘুমুলে তুই কি রাগ করবি?

নাতাশা হাসল। মিষ্টি হাসি। হাসতে হাসতে বলল, মা, তোমার ঘুম আসছে না, তাই না?

ঠিক ধরেছিস।

এবং তুমি একটু ভয় পেয়েছ।

ভয় পাব কেন?

টেলিফোনের শব্দ শুনে ভয় পেয়েছ।

আমি এত সহজে ভয় পাই না।

আজ একটু পেয়েছ।

আচ্ছা যা, একটু পেয়েছি।

দিলশাদ পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। নাতাশা যে বলেছে মশা নেই তা ঠিক না। এই তো একটা মশা রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। খুঁজলে নিশ্চয়ই আরো পাওয়া যাবে। নাতাশা বলল, তোমার বালিশ লাগবে না?

না।

নাতাশার মাথা ধরেছে। চাপা যন্ত্রণা হচ্ছে। এই যন্ত্রণা শুরু হলে দুটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। হয় কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচণ্ড ঘুম পায়, নয়তো ব্যথা দেখতে দেখতে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তখন ইচ্ছা করে প্রচণ্ড শব্দে দেয়ালে মাথা ঠুকে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলতে। যেন মাথাটা ফাটলেই ব্যথাটা বের হয়ে যাবে। আজ মাথার চাপা ব্যথাটা কোন দিকে যাবে নাতাশা বুঝতে পারছে না। আতঙ্কে তার শরীরের ভেতরটা কাঁপছে। এই কাপন বাইরের কারো বোঝার উপায় নেই।

নাতাশা!

কী মা?

তুই কি তোর বাবাকে তোর অসুখের কথা কিছু লিখেছিস?

না।

না লেখাই ভালো, শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তা করবে। বিদেশে যাবার সব ঠিকঠাক হলে আমিই জানাব।

আচ্ছা।

গল্প শুনবি?

শুনব।

নাতাশা মার কাছ থেকে একটু দূরত্ব রেখে শুয়েছে। দিলশাদ মেয়ের গা ঘেসে এলো। একটা হাত রাখল মেয়ের গায়ের উপর। হালকা করে রাখল যেন চাপ না পড়ে।

ভূতের গল্প শুনবি?

হুঁ।

ভূতের গল্প শুনে আবার ভয় পাবি না তো?

ভয় পাবার জন্যেই তো ভূতের গল্প শোনা। হাসার জন্যে তো কেউ ভূতের গল্প শুনে না।

তাও তো কথা। শোন তাহলে, সত্যিকার ভূতের গল্প। এক বর্ণ মিথ্যা না। আমার মার মামার বাড়ি হচ্ছে সান্দিকোনা বলে একটা জায়গায়। তারা এককালে বিরাট জমিদার ছিলেন। খুব রমরমা ছিল। তাদের বসতবাড়ির নাম ছিল শতদুয়ারি। বাড়িটার দরজা ছিল একশটা। এইজন্যে শতদুয়ারি নাম। প্রকাণ্ড সব দরজা। যেমন মজবুত তেমন ভারি। দরজার কজায় প্রতি সোমবারে ঘি দেওয়া হতো যেন কাঁচ ক্যাচ শব্দ না হয়। সপ্তাহে ঘিয়ের বরাদ্দ ছিল একসের এক ছটাক...।

তুমি দেখেছ সেই বাড়ি?

হ্যাঁ। সেই গল্পই তো বলছি।

এখনো ঘি দেয়?

এখন ঘি দেবে কোত্থেকে? খাওয়ারই পয়সা জুটে না আর ঘি! গল্পটা শোন। শতদুয়ারি বাড়ির একটা দুয়ার সবসময় বন্ধ থাকত। খোলা নিষেধ ছিল। আমার নানাজানের বাবা নিষেধ করে গিয়েছিলেন। শুধু যে মুখে নিষেধ করে গিয়েছিলেন তাই না– দরজার গায়ে খোদাই করে লিখে গিয়েছিলেন। সংস্কৃত মেশানো অদ্ভুত বাংলা অদ্য দ্বাত্রিংশ শ্রাবণঃ ঐশ্য নির্দেশং ক্ষুধিতং...।

তোমার মুখস্থ মা?

হ্যাঁ। ছোটবেলায় একবার গিয়েছিলাম। আমি আর বড় আপা। তখন মুখস্থ করেছি।

তোমার বয়স তখন কত?

ঠিক খেয়াল নেই। তবে কত আর হবে? সাত-আট হবে।

কোন ক্লাসে পড়তে?

তোর সঙ্গে গল্প করা ভারি মুশকিল। এত প্রশ্নের জবাব দিয়ে কি আর গল্প করা যায়?

কোন ক্লাসে পড়তে মনে নেই?

না।

আচ্ছা আর প্রশ্ন করব না। তুমি বলো।

দিলশাদ খুব আগ্রহ নিয়ে গল্প শুরু করল।

নাতাশা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। তার শরীর ঝিম ঝিম করছে। বড় ধরনের কোনো আনন্দময় ঘটনার আগে আগে শরীর যেমন ঝিম ঝিম করে সেরকম। নাতাশার এই আনন্দের কারণ তার মা'র গল্প নয়। আনন্দের কারণ হচ্ছে তার মাথাব্যথাটা ঘুমের দিকে যাচ্ছে। এক্ষুনি সে ঘুমিয়ে পড়বে। মা'র গল্প এখন খুব অস্পষ্টভাবে তার কানে যাচ্ছে। মা যেন ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছেন। তার গলার স্বর অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে। নাতাশার ঘুম আসছে গাঢ় ঘুম, শান্তিময় ঘুম।

সেদিন কী হলো নাতাশা শোন। ঠিক করা হলো বন্ধ দরজাটা খোলা হবে। তালার চাবি তো অনেক আগে থেকেই নেই। মিস্ত্রি আনা হয়েছে তালা খোলার জন্যে। সে সন্ধ্যা থেকেই তালা খোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তালা খুলছে না... নাতাশা, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?....

নাতাশা জবাব দিল না। দিলশাদ মেয়ের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শুনল। ঘুমিয়ে পড়েছে। দিলশাদ মেয়ের কপালে হাত রাখল। কপাল ভেজা। সে ঘামছে। এমন ঘামা ঘেমেছে, মনে হচ্ছে গোসল সেরে উঠল।

গল্পটা শেষ করতে না পেরে দিলশাদের খারাপ লাগছে। আজ আর ঘুম আসবে না। তার বিশ্রী স্বভাব হয়েছে, রাতে ঘুম ভাঙলে আর ঘুম আসে না। সারারাত জেগে থাকতে হয়। তখন বড় নিঃসঙ্গ লাগে। দিলশাদ সাবধানে মেয়ের পাশ থেকে উঠে এলো। অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে পুবদিকের বারান্দার দরজা খুলল। খুব সাবধানে খুলল। মেয়ের ঘুম যেন না ভাঙে। বিছানা থেকে নেমে আসার পর মনে হলো আরে, মশাগুলি তো মারা হলো না। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। দিলশাদ বারান্দার দিকে পা বাড়াল।

রেলিং দেয়া ছোট্ট বারান্দা। নামেই বারান্দা। আলো-বাতাস নেই। আকাশ দেখা যায় না। বারান্দার সামনে নতুন অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং উঠছে– বারোতলা দালান। দৈত্যের মতো এই দালান দিলশাদের ছোট্ট বারান্দা ঢেকে ফেলেছে। রাতের বেলা বারান্দায় এলে সামনের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটাকে জেলের পাঁচিলের মতো লাগে।

বারান্দায় একটা গদি বসানো বেতের চেয়ার আছে। মেঝের পুরোটা ওয়াল টু ওয়াল কার্পেটের মতো করে শীতল পাটিতে ঢাকা। ছাদের কার্নিশ থেকে ঝুলন্ত টবে অর্কিড। দিলশাদের খুব শখের গাছ। নীল রঙের ফুল যখন ফুটে দিলশাদের অদ্ভুত লাগে।

দিলশাদ বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসল না। মেঝের শীতল পাটিতে বাচ্চাদের মতো পা ছড়িয়ে বসল। কাল বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। কাল সারাদিনে কী করবে ভেবে নেয়া যাক। অফিসের পর সে বাসায় না এসে সরাসরি চলে যাবে বড় দুলাভাই ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের অফিসে। ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের নিজের অফিস বলেই তিনি ছুটির দিনেও অফিসে থাকেন। তারপরেও টেলিফোন করে যাবে। নাতাশাকে বাইরে পাঠানোর টাকা এক্ষুনি জোগাড় করতে হবে। হাতে সময় নেই। বড় দুলাভাইয়ের কাছে সরাসরি চাওয়াই ভালো। আপার কাছে চেয়ে কিছু হবে না। দুলাভাইয়ের সংসারে আপার অবস্থা জাপানি পুতুলের মতো। তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে। এর বেশি কিছু না।

ওয়াদুদুর রহমান সাহেবকে দিলশাদ সহ্যই করতে পারে না। তার আচার আচরণ দিলশাদের কাছে অতীতে অরুচিকর মনে হয়েছে, এখনো হয়। বড় আপার বিয়ের পর তিনি এক রাতে তাঁর দুই শালী এবং স্ত্রীকে রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে ঘোষণা দিলেন আমার দুই শালী থাকবে আমার দুই পাশে এবং আমি আমার দুহাত শালীদের কোলে ফেলে রাখব। এইটুকু সুযোগ না পেলে সুন্দরী শালী থাকার মানে কী? হা হা হা।

তিনি যে সিনেমাহলে ঢুকে সত্যি সত্যি শালীদের কোলে হাত রাখবেন দিলশাদ তা কল্পনাও করে নি। সে হতভম্ব হয়ে গেল এবং চাপা গলায় বলল, দুলাভাই, হাত সরিয়ে নিন। ওয়াদুদুর রহমান বললেন, পাগল হয়েছে? দিলশাদ বলল, দুলাভাই, আমি কিন্তু উঠে চলে যাব। ওয়াদুদুর রহমান হাত সরিয়ে নিলেন।

বাসায় ফিরে দিলশাদের বড় আপা দিলশাদের সঙ্গে খুব রাগরাগি করল। থমথমে গলায় বলল, তুই এরকম করলি কেন? তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে? দুলাভাইরা শালীদের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করে না? তুই বিশ্রী ব্যবহার করলি! বেচারা মনে কষ্ট পেয়েছে। কেমন গম্ভীর হয়ে আছে।

দিলশাদ বলল, গম্ভীর হয়ে থাকলেও কিছু করার নেই আপা। এই জাতীয় ঠাট্টা আমার পছন্দ না।

কোলে হাত রাখলে কী হয়?

কিছুই হয় না, কিন্তু আমার ভালো লাগে না।

আসলে তুই বেশি পেকে গেছিস। এত পাকা ভালো না।

পেকে যখন গেছি তখন তো আর করার কিছু নেই। পেকে যাওয়া ফল কাঁচা করার কোনো পদ্ধতি নেই।

এখন চা নিয়ে তোর দুলাভাইয়ের কাছে যা, তার রাগ ভাঙা। বেচারা যা মন খারাপ করেছে আমারই কান্না পাচ্ছে।

দিলশাদ চা নিয়ে গেল। দেখল, দুলাভাই মোটেই মন খারাপ করে নেই। দিলশাদের মেজোআপা দিলরুবার সঙ্গে মোটা দাগের রসিকতা করে যাচ্ছেন। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছেন। দিলশাদের বড় আপা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং হাসিমুখে বলল,

এই শোন, দিলুদের ঐ গল্পটা বলো তো, মোটা শাশুড়ি আর চিকন বৌয়ের গল্প। একটু অবসিন কিন্তু দারুণ ফানি। ওরা শুনলে মজা পাবে। প্লিজ। একটু রেখে-ঢেকে বলল।

ওয়াদুদুর রহমান তৎক্ষণাৎ মোটা শাশুড়ি আর চিকন বৌয়ের গল্প শুরু করলেন। রেখে-ঢেকে বলার পরেও গল্পের শেষটা শুনে দিলশাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার উপক্রম হলো। তার বড় আপা হাসতে হাসতে বিষম খেয়ে হেঁচকি উঠিয়ে ফেলল। দিলশাদ ভেবে পেল না তার আপা কী করে এমন আপত্তিকর একটা গল্প তাদের বলতে বলল। বোকা বলেই বোধহয় বলল। স্বামীকে খুশি করার জন্যে বোকা স্ত্রীরা হাস্যকর সব জিনিস করে।

ওয়াদুদুর রহমান কি দিলশাদকে লাখ দুই টাকা দেবেন না? সম্ভবত দেবেন। তাঁর হাতে টাকা আছে। তবে দ্রলোক যেহেতু ব্যবসায়ী সেহেতু টাকা ফেরত আসবে কি-না এই চিন্তাটা তাঁর মাথায় থাকবে। দিলশাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ভদ্রলোকের মাথা থেকে এই দুঃশ্চিন্তা দূর করা। কীভাবে দিলশাদ তা করবে তা ঠিক করা আছে। সে অনেক ভেবে-টেবে ঠিক করেছে।

দিলশাদের বাবার হাতেও কিছু টাকা আছে। তার বাবা রিটায়ার্ড ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হাদিউজ্জামান সাহেব তার গ্র্যাচুইটি, সারেন্ডার করে দেওয়া পেনশনের টাকা ব্যাংকে জমা করে রেখেছেন। টাকার পরিমাণ ঠিক কত তা দিলশাদ জানে না। তবে তার অনুমান তিন-চার লাখ টাকা হবে। তাঁর কলাবাগানের দুতলা বাড়ির একতলায় তিনি থাকেন। দুতলাটা ভাড়া দেন। ভাড়ার টাকায় খুব হিসেব করে সংসার চালান।

হাদিউজ্জামান সাহেব প্রায়ই বলেন, আমার তো আর ছেলে নেই যে, বুড়ো বয়সে ছেলের সংসারে থাকব। মেয়েদের সংসার হলো পরের সংসার, সেখানে আমাদের জায়গা হবে

না। আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরই দেখতে হবে। আমি কাউকে কিছু দেব না। অন্যদেরও আমাকে কিছু দিতে হবে না।

গত রোজার ঈদে দিলশাদ তার বাবার জন্যে মটকার একটা পাঞ্জাবি এবং মা'র জন্যে টাঙ্গাইলের সুতির শাড়ি নিয়ে গেল। হাদিউজ্জামান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, মা, পাঞ্জাবি এনেছ অত্যন্ত খুশি হয়েছি। কিন্তু আমি তো মা তোমার এই পাঞ্জাবি রাখতে পারব না। ইসলাম ধর্মে পুরুষদের রেশমি পোশাক পরা নিষেধ।

দিলশাদ বলল, এটা বদলে সুতির পাঞ্জাবি নিয়ে আসি?

না। আমার জন্যে এবং তোমার মার জন্যে কিছুই আনবে না। উপহার পেলেই উপহার দিতে হয়। আমার কিছু দেবার সামর্থ্য যখন নেই তখন নেবার উপায়ও নেই। তোমরা কষ্ট পাও বা রাগ কর আমার কিছুই করার নেই।

দিলশাদের ধারণা তার বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপের বীজ আগেই ছিল। যেদিন রিটায়ার করলেন সেদিনই বীজ থেকে চারা বের হলো। যত দিন যাচ্ছে ততই চারা ডালপালা প্রসারিত করে বাড়ছে। সারাজীবন ঘোর নাস্তিক হাদিউজ্জামান সাহেব এখন এক পীর সাহেবের কাছে যাতায়াত শুরু করেছেন। যুবক বয়েসী পীর। চুল-দাড়ি সবই কালো। তাকেই তিনি পরম শ্রদ্ধাভরে বাবা ডাকছেন। দেখা হলেই কদমবুসি করছেন। কঠিন কদমবুসি। পা থেকে ধুলা নিয়ে সত্যি সত্যি কপালে ঘষেন। পীর সাহেব তাঁকে দশলক্ষ একবার সূরা কাফ পড়তে বলেছেন। পড়া শেষ হলেই তিনি তাকে নিয়ে চিল্লায় যাবেন। সেখানে তার জন্যে খাস দিলে দোয়া করা হবে। যার পরপরই বাতেনি জগৎ হাদিউজ্জামান সাহেবের কাছে ধরা দেবে।

বাতেনি জগৎ ধরার জন্যে হাদিউজ্জামান সাহেব এখন সূরা কাফ পড়ে যাচ্ছেন। চার লক্ষ বারের মতো পড়া শেষ হয়েছে। সূরা পাঠের জন্য একটা ঘর আলাদা করা হয়েছে। সেই ঘরে কোনো আসবাব নেই। তিনি নিজের হাতে মেঝে ধোয়ামোছা করেন। অন্য কারো সেই ঘরে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ। মাগরেবের নামাজের পর তিনি তাঁর এই ঘরে মোমবাতি জ্বেলে দেন। মোমবাতির আলোয় সূরাপাঠ চলতে থাকে। এশার নামাজের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত সূরাপাঠ থামে না। রাতে যখন ঘর থেকে বের হন তখন ঘামে তার সারা শরীর ভেজা থাকে। চোখ হয় টকটকে লাল। তিনি নাকি সূরাপাঠের সময় বিচিত্র সব শব্দ শুনতে পান। কারা নাকি তার কানে পেছন দিক থেকে ফুঁ দেয়।

এ দেশের স্ত্রীরা যতই স্বাধীনচেতা হোক, তারা স্বামীর অনুকরণ ও অনুসরণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারেন না। দিলশাদের মা মনোয়ারা বেগমও তার ব্যতিক্রম নন। তিনিও এখন নিয়মিত স্বামীর সঙ্গে পীর সাহেবের কাছে যান। পীর সাহেবকে ভক্তিভরে কদমবুসি করেন। তিনিও মাগরেবের পর তসবি হাতে বসেন এশার নামাজের আগে সেই তসবি তার হাত থেকে নামে না। ইদানীং তিনিও বলছেন তসবি পাঠের সময় কারা যেন তার চারপাশে ফিসফাস করে। তিনি অপূর্ব সুগন্ধ পান। কাঁঠালিচাপা ফুলের গন্ধের মতো গন্ধ। সেই গন্ধে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে। দিলশাদের ধারণা তার মা'র এই কথাগুলো বানানো। তিনি স্বামীকে খুশি করার জন্যেই মিথ্যা গল্প বানিয়েছেন।

মনোয়ারা বেগম তার মেয়েকে বলে দিয়েছেন এক লাখ টাকার ব্যবস্থা তিনি যেভাবেই হোক করে দেবেন। এই ব্যাপারে দিলশাদ যেন নিশ্চিন্ত থাকে। দিলশাদ নিশ্চিন্ত নেই। কারণ টাকাপয়সা মনোয়ারার নিয়ন্ত্রণে নেই। হাদিউজ্জামান সাহেব বর্তমানে বাতেনি

জগতের সন্ধানে ব্যস্ত থাকলেও ইহলৌকিক ব্যাপারগুলিও কঠিন নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। একপোয়া মুড়ি আনার জন্যে দশটা টাকাও মনোয়ারা বেগমকে স্বামীর কাছ থেকে নিতে হয়।

দিলশাদ ঠিক করেছে সে তার বাবার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে। এই কথোপকথনে সে মাকেও সঙ্গে রাখবে না। স্ত্রীর সমর্থনসূচক যে-কোনো কথায় হাদিউজ্জামান সাহেব বিরক্ত হন। এই মুহূর্তে বাবার বিরক্তি তার কাম্য নয়।

টাকার জন্যে সাজ্জাদের দিক থেকে যে-সব আত্মীয়স্বজন আছে তাদের কাছে কি সে যাবে? যাবার কোনো মানে হয় না। সাজ্জাদের বড়ভাই থাকেন জয়দেবপুরে। রাইস রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সিনিয়ার সাইন্টিফিক অফিসার। তাকে তার নিজের সংসার দেখতে হয় এবং বিধবা ছোটবোনের সংসার দেখতে হয়। দ্রলোকের স্ত্রী আর্থাইটিসে প্রায় পঙ্গু। ভয়াবহ টানাটানিতে সংসার চলে। তারপরেও ব্যবসার জন্যে তিনি সাজ্জাদকে একসময় দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। প্রভিডেন্ট ফান্ডে তার কিছু ছিল না। টাকাটা দিয়েছিলেন ধার করে। সেই টাকা ফেরত দেয়া হয় নি।

নাতাশার খবর জানলে তিনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তবে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না। খুব লজ্জার মধ্যে পড়বেন। কী দরকার তাকে লজ্জা দিয়ে।

সাজ্জাদের এক মামা থাকেন পুরনো ঢাকায়। দ্রলোকের প্রচুর টাকা। কাপড়ের ব্যবসা করেন। দিলশাদের বিয়েতে একশ টাকার প্রাইজবন্ড দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। তবু দিলশাদ একবার যাবে। ভয়ঙ্কর কৃপণ মানুষও মাঝে মাঝে খুব দয়ালু হয়ে যায়। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কিছু নেই।

দিলশাদের নিজের সঞ্চয় সামান্যই। বিয়ের সময়ে পাওয়া বেশ কিছু গয়না ছিল। তার বাবা দিয়েছিলেন। মা নিজের গয়না তিন ভাগ করে তিন মেয়েকে দিয়েছিলেন। তার পরিমাণও কম ছিল না। সেইসব গয়নার কিছুই নেই। একদিন কী কারণে স্টিলের আলমারির লকার খুলে দেখে লকারে রাখা বিসকিটের টিন খালি। বিসকিটের টিনে সব গয়না ছিল। দিলশাদ শুধু উপন্যাসেই পড়েছে স্বামী নেশার পয়সার জন্যে স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে দেয়। স্ত্রী গয়নার শোকে কাঁদতে কাঁদতে বিছানা নেয়। উপন্যাসের মতোই তার জীবনে গয়না বিক্রির ব্যাপার ঘটেছে, শুধু সে কাঁদতে কাঁদতে বিছানা নেয় নি। শান্ত গলায় বলেছে- কাজটা করলে কীভাবে? একদিনে নিশ্চয়ই সব গয়না বিক্রি কর নি আস্তে আস্তে করেছ, তাই না? না-কি একদিনেই বিক্রি করেছ?

সাজ্জাদ অস্বস্তির সঙ্গে বলেছে, বিক্রি করি নি। বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছি। তোমাকে রশিদ দেখাতে পারব।

দেখাও, রশিদ দেখাও।

সাজ্জাদ রশিদ খোঁজা শুরু করল। এই স্যুটকেস খুঁজে, ঐ স্যুটকেস খুঁজে। বইয়ের পাতার ফাঁকে দেখে। রশিদ খোজার আশ্চর্য অভিনয়।

দিলু, তুমি বিশ্বাস করছ না। রশিদ সত্যি আছে। তোমার চোখে যেন না পড়ে সে-জন্যে গোপনে কোনো জায়গায় রেখে নিজেই ভুলে গেছি। তিন মাসের মধ্যে তোমার সব গয়না আমি এনে দিব। আজ থেকে ঠিক তিন মাস।

অনেক তিন মাস পার হয়েছে, গয়না আসে নি। আর কোনোদিন এই প্রসঙ্গ নিয়ে দিলশাদ কথা বলে নি। তার রুচি হয় নি।

নাতাশা তার বাবার এই দিকগুলি জানে না। দিলশাদ জানতে দেয় নি। মেয়েটা তার বাবাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। বাবার এইসব দুর্বলতা জানার পরেও সে নিশ্চয়ই তার বাবাকে ভালোবাসবে কিন্তু মেয়েটার ভালোবাসার অপমান হবে। মা হয়ে দিলশাদ তা করতে দিতে পারে না।

দিলশাদ খুব ভালো করে জানে, নাতাশা তার বাবা-মা'র ভেতরের প্রচণ্ড দূরত্বের জন্যে তাকেই দায়ী করে। কারণ তাকেই সাজ্জাদের সঙ্গে রূঢ় কঠিন আচরণগুলি করতে হয়। নাতাশা শুধু তিক্ততাটাই দেখে তিক্ততার উৎস সম্পর্কে জানে না। যেমন- নাতাশা কোনোদিনই জানবে না তার মেজোখালা এক সন্ধ্যাবেলা এসে ফিসফিস করে দিলশাদকে কী বলে গেল।

সে শুধু দেখেছে, তার মা পাথরের মতো হয়ে গেছে। রাতে কিছু খায় নি। এবং সারারাত এক ফোঁটা ঘুমায় নি। ভোরবেলা নাতাশা বলেছিল, তোমার কী হয়েছে মা? তোমাকে এমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে কেন?

দিলশাদ বলেছে- মারে, আমার শরীরটা খারাপ।

নাতাশা বলেছে–তোমার শরীর খারাপ না মা। তোমার মন খারাপ। শরীর খারাপ হলে চেহারা একভাবে খারাপ হয়। মন খারাপ হলে অন্যভাবে খারাপ হয়। বলল তো কী হয়েছে?

দিলশাদ চুপ করে থেকেছে। সেদিন সে অফিসেও যায় নি, তার বারান্দায় চুপচাপ বসেছিল। নটার দিকে সাজ্জাদ ব্রাশ দিয়ে দাঁত ঘসতে ঘসতে বারান্দায় এসে বলল, কী ব্যাপার, অফিস যাও নি?

দিলশাদ বলেছে–না।

শরীর খারাপ করেছে? জ্বর-জারি? দেখি টেম্পারেচারটা দেখি।

দিলশাদ কঠিন গলায় বলেছে, গায়ে হাত দেবে না।

এর জবাবে সাজ্জাদ কী একটা রসিকতা যেন করেছিল। কী রসিকতা করেছিল দিলশাদের মনে নেই। তার শুধু মনে আছে সে ভেতরে ভেতরে থরথর করে কাঁপছিল। তার মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল– তুমি মেজোআপার বাসায় গত বৃহস্পতিবার গিয়ে কী করেছ?

সে নিজেকে সামলেছে। কথাগুলি বলা কষ্টের, না বলা আরো কষ্টের।

দিলশাদের মেজোআপা দিলরুবা অবশ্যি খুব সহজভাবেই কথাগুলি বলেছে। সন্ধ্যাবেলা এসেছে। চা খেয়েছে। গল্পটল্প করে উঠে চলে যাবার সময় হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলেছে দিল, তোকে একটা কথা বলি। রাগ করিস না।

দিলশাদ বলল, এমন কী কথা বলবে যে রাগ করব?

হাসব্যান্ডের ব্যাপারে মেয়েরা খুব সেনসেটিভ হয়– এইজন্যেই বলছি।

দিলশাদ শংকিত চোখে তাকাল। দিলরুবা বলল, সাজ্জাদ তোর মেজো দুলাভাইয়ের কাছে বেশ কয়েকবার এসেছে। তার কিছু টাকা দরকার এইজন্যে। এটা তুই বোধহয় জানিস।

না, আমি জানি না।

যাই হোক, ও বিশ হাজার টাকা চাচ্ছে। তোর দুলাভাই দিতে পারছে না। তার ব্যবসার অবস্থা ভালো না। সে স্পষ্ট না করে দিয়েছে। তারপরেও বার বার এসে, এমন চাপাচাপি– খুব অস্বস্তিকর অবস্থা।

আমাকে বলল নি কেন?

আমি ভাবতাম তুই জানিস।

না, আমি জানতাম না।

যাই হোক, সমস্যায় পড়লে আত্মীয়স্বজনের কাছে টাকা ধার চাওয়া কোনো অন্যায় না।

এরচে অন্যায় কিছু কি সে করেছে?

দিলরুবা হাসিমুখে বলল, তুই চোখ-মুখ যেভাবে শক্ত করে ফেলেছিস, তোকে বলতেই তো ভয় লাগছে। যাই হোক, শোন, সাজ্জাদ গত বৃহস্পতিবার গিয়েছে আমাদের বাসায়। আমরা কেউ বাসায় ছিলাম না। ও রাত নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। আমার কাজের বুয়া তাকে চা দিয়েছে। ফ্রিজে গাজরের হালুয়া ছিল। হালুয়া দিয়েছে। ও খেয়েদেয়ে চলে

এসেছে। তারপর থেকে বসার ঘরে সাইড টেবিলে রাখা কৃস্টালের ঘড়িটা নেই। এবোনাইটের উপর কৃস্টালের যে ঘড়ি। মৎস্যকন্যার মূর্তির মতো।

তুমি বলতে চাচ্ছ ঘড়িটা সে চুরি করেছে?

আমার কাজের মেয়েটা বলছিল সে হালুয়া নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে সাজ্জাদের। হাতে ঘড়ি। সে খুব মন দিয়ে ঘড়ি দেখছে।

দিলশাদ আবার বলল, তুমি বলতে চাচ্ছ সে তোমার ঘড়ি চুরি করেছে?

এই তো তুই রেগে যাচ্ছিস। হয়তো ঠাট্টা করে নিয়েছে। হয়তো মনের ভুলে পকেটে রেখে দিয়েছে। এইরকম ভুল তো মানুষ সবসময় করে। করে না? তবে ঘড়িটা তোর দুলাভাইয়ের খুব শখের। সেবার আমেরিকায় গিয়ে 'মেসিস' স্টোর থেকে কিনেছে। ট্যাক্স নিয়ে দাম পড়েছে দুশ চল্লিশ ডলার। দামটা কোনো ব্যাপার না– শখের জিনিস তো। টাকা দিয়ে তো আর শখের জিনিসের দাম হয় না।

হড়বড় করে দিলরুবা আরো অনেক কথা বলেছে কিছুই দিলশাদের কানে যায় নি। সে পলকহীন চোখে তাকিয়েছিল, একবার শুধু চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল- আপা, চুপ কর। প্লিজ চুপ কর। তাও বলে নি।

সাজ্জাদ যেদিন বলল, সে বান্দরবন যাবে সেদিন আন্তরিকভাবেই দিলশাদ খুশি হয়েছিল। চলে যাক। চোখের আড়ালে চলে যাক। চলে যাবার দিন সে সাজ্জাদের সঙ্গে খুব খারাপ

ব্যবহার করেছে। খারাপ ব্যবহারটা নাতাশার চোখে পড়েছে। খারাপ ব্যবহারের পেছনের কারণটা সে জানে না। কোনোদিন জানবে না। সবকিছু সবাইকে জানতে নেই।

.

ফজরের আজান পড়ছে। ঢাকা শহরে শত শত মসজিদ। আগামী দশ মিনিট ধরে আজান হতে থাকবে। কাছ থেকে, দূর থেকে ঘুম ভাঙানোর জন্যে মোয়াজ্জিন অতি মধুর গলায় আহ্বান জানাবেন–

"আসসালাতু খাইরুম মিনাননাউম।"

'ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম।"

দিলশাদের নানিজান তাকে বলেছিলেন, ঘুম ভাঙানোর জন্যে আজান দেওয়া হলেও, যারা দুষ্ট লোক, আজানের শব্দে তাদের ঘুম গাঢ় হয়। ফজরের আজান হচ্ছে তাদের কাছে ঘুমপাড়ানি গানের মতো। দিলশাদের মনে হচ্ছে সে একজন দুষ্ট মহিলা। আজানের শব্দে ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সে পাটিতে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে শরীরের প্রতিটি জীবকোষ ঘুমিয়ে পড়ছে। গভীর অবসাদের ঘুম। যেন এই ঘুম কোনোদিন ভাঙবে না।

৩. মতিঝিলের বারোতলা দালান

মতিঝিলের বারোতলা দালানের নতলায় ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের অফিস রহমান ট্রেডিং কোম্পানি। দুকামরার অফিস। দুকামরার একটায় কর্মচারীরা বসে, অন্যটা দুভাগ করা হয়েছে। সেই দুভাগের একভাগে ওয়াদুদ সাহেবের অফিস ঘর, অন্যটা তাঁর খাস কামরা। খাস কামরা সুন্দর করে সাজানো। বিরাট একটা জানালা। জানালার দিকে পেছন ফিরে ওয়াদুদ সাহেব বসেন। কারণ জানালা দিয়ে তাকালে তার মাথা ঘোরে। তার উচ্চতা-ভীতি আছে। তিনি বসেন নিচু রিভলভিং চেয়ারে। মানুষটা বেটে বলে চেয়ারে বসলে তাঁকে প্রায় দেখাই যায় না। তার সামনে প্রকাণ্ড টেবিল। টেবিলটাই ঘরের অনেক জায়গা নিয়ে নিয়েছে।

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব তার খাস কামরায় খালিগায়ে বসেছিলেন। মানুষটা অতিরিক্ত রকমের ফরসা। বয়সের কারণে শরীরে থলথলে ভাব চলে এসেছে। তার কাঁধে ভেজা একটা টাওয়েল। টেবিলের সামনে এক কাপ কফি। মুখ বিকৃত করে তিনি কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে কফিটা তিনি ওষুধের মতো খাচ্ছেন। দিলশাদকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি হাসিমুখে তাকালেন। দিলশাদ বলল, ব্যাপার কী?

ওয়াদুদুর রহমান বললেন, কোন ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছ? নেংটো হয়ে বসে আছি কেন? ঘরের এসি নষ্ট। ঠিক করার জন্যে মিস্ত্রি এনেছিলাম। গাধাটা কিছুই জানে না। কী সব খুটখাট করেছে। এখন পুরো নতলায় কারেন্ট অফ। গরমে সিদ্ধ হচ্ছি। চলে যেতাম। তুমি আসবে বলেছ, কাজেই বসে আছি। প্রতীক্ষা করছি। সুন্দরী শ্যালিকা গোপনে দেখা করতে চাচ্ছে– এই সুযোগ হারাবার মতো বোকা আমি না। এখন বলো তোমার কী খবর?

ভালো।

জগতের কুৎসিততম কফি খেতে চাইলে খাওয়াতে পারি। খাবে?

দিলশাদ বসতে বসতে বলল, জি-না।

ওয়াদুদুর রহমান বললেন, এত দূরে বসো না তো দিলু। আমার পাশে এসে বসো। যেন ইচ্ছা করলেই আমি তোমার হাত ধরতে পারি। সুন্দরী শালীদের হাত ধরায় পাপ হয় না। হা হা হা। আচ্ছা, তোমার অনুমান শক্তি কেমন তার একটা

পরীক্ষা হয়ে যাক। বলো তো অফিসের বড় সাহেবদের খাস কামরার টেবিলটা খাটের মতো প্রকাণ্ড হয় কেন? দেখি তোমার অনুমান।

দিলশাদ বিব্রত গলায় বলল, দুলাভাই, আমার অনুমান ভালো না।

তোমাকে একটু হিন্টস দিচ্ছি। সেইসব বড় সাহেবদের অফিসেই প্রকাণ্ড টেবিল থাকে যাদের সুন্দরী স্টেনো থাকে। এখন পারবে, না আরো হিন্টস লাগবে? হা হা হা।

দিলশাদ অস্বস্তি বোধ করছে। সে অস্বস্তি কাটাবার জন্যে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ওয়াদুদুর রহমান হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, দুএক দিনের ভেতর তোমার বাসায় যাব বলে ঠিক করে রেখেছি। এমন সব ঝামেলায় জড়িয়েছি, যেতে পারছি না। আসল খবরই জিজ্ঞেস করা হয় নি। নাতাশা কেমন আছে? ওর খবর কী?

আগের মতোই।

স্টেবল কি-না সেটা বলো।

বুঝতে পারছি না।

তোমার তো বুঝতে পারার কথাও না। ডাক্তার কী বলছে?

ডাক্তার সাহেব বলছেন– স্টেবল। উনি আমেরিকার এক হাসপাতালের সঙ্গে কথা বলে সব ঠিকঠাক করেছেন। ওকে নিয়ে গেলেই অপারেশন হবে।

নিচ্ছ কবে?

সামনের মাসের দু তারিখে যাব। হাতে এখনো এক মাসের মতো আছে।

টাকা পয়সার ব্যবস্থা কী করেছ?

দিলশাদ সহজ গলায় বলল, জোগাড় করার জন্যে এখন পথে নেমেছি। প্রথমেই আপনার কাছে এসেছি।

আমার কাছে আসার দরকার ছিল না। আমি নিজেই তোমার কাছে যেতাম। তোমাকে তিন লাখ টাকা যাতে দিতে পারি সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। ব্যবসা যারা করে তাদের কাছে ক্যাশ টাকা থাকে না। সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারে না। খুব বড় বড় ব্যবসায়ীও দেখবে

বিপদের সময় বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা বের করতে পারছে না। যাই হোক, তোমার টাকা কী পরিমাণ লাগবে?

অপারেশন আর হাসপাতাল খরচ লাগবে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার ডলারের মতো।

তার মানে প্রায় এগার লাখ টাকা লাগবে। তোমাকে আরো আটের জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

হ্যাঁ।

পারবে?

পারব।

ভেরি গুড। তুমি আটের ব্যবস্থা কর। আমারটা আমি ডলার করে তুমি প্লেনে উঠার আগে আগে তোমার হাতে দিয়ে দিব। কিংবা এমন ব্যবস্থা করব যেন আমেরিকায় তুমি ডলার পেয়ে যাও।

থ্যাংক য়্যু দুলাভাই।

থ্যাংকস দেয়ার কিছু নেই। নাতাশা শুধু তোমার মেয়ে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। সে আমাদেরও মেয়ে। ওর খবর শোনার পর সারারাত আমি ঘুমুতে পারি নি। তোমার আপা চিৎকার করে কেঁদেছে।

দিলশাদ বলল, দুলাভাই, আপনার টাকাটা আমি ফেরত দেব। দেরি হবে, কিন্তু ফেরত দেব। আমি আপনার কাছ থেকে ভিক্ষা হিসাবে নিচ্ছি না। ধার হিসেবে নিচ্ছি।

ধার না ভিক্ষা এইসব পরে বিবেচনা করা যাবে। আপাতত আমরা আলোচনাটা অন্যখাতে নিয়ে যাই। তার আগে বলো কিছু খাবে? মনে হচ্ছে সরাসরি অফিস থেকে এসেছ। খিদে লেগেছে নিশ্চয়ই। সিঙারা খাবে?

খাব।

রিলাক্সড হয়ে বসো তো। বিপদ-আপদ থাকবেই। বিপদ-আপদ মাথায় নিয়েই আমাদের বাস করতে হবে। অবশ্যি গরম যা পড়েছে এতে রিলাক্সড হওয়াও কঠিন। বুঝলে দিলু, দেশটা মরুভূমি হতে বেশি বাকি নেই। কিছুদিনের মধ্যেই দেখবে কোরাবানির হাটে উট পাওয়া যাবে।

দিলশাদ স্বস্তি বোধ করছে। নিজের মুখে টাকা চাওয়ার বিড়ম্বনায় যেতে হয় নি। পৃথিবীর সবচে’ গ্লানিকর কাজ হচ্ছে টাকা ধার চাওয়া। যে চায় সেও গ্লানির ভেতরে পড়ে, যার কাছে চাওয়া হয় সেও পড়ে। এই গ্লানি কোনোভাবেই দূর হয় না।

দিলু!

জি।

পার্সোনাল একটা প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি। কিছু মনে করো না। জবাব দিতে না চাইলে জবাব দেবার দরকারও নেই। মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেস করব বলে ভাবি। শেষে আর জিজ্ঞেস করা হয় না।

দিলশাদ শুকনো গলায় বলল, কী জানতে চাচ্ছেন বলুন।

সাজ্জাদের ব্যাপারটা কী বলো তো?

দিলশাদ হালকা গলায় বলল, বলার মতো কোনো ব্যাপার নেই।

তোমার এই দুঃসময় আর সে জঙ্গলে পড়ে আছে। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ফানি লাগছে।

দিলশাদ কিছু বলল না। অফিসের পিওন সিঙাড়া নিয়ে এসেছে। পিরিচে ঢাকা চা। দিলশাদ সিঙাড়া হাতে নিল। ওয়াদুদুর রহমান একটু ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার আপার কাছ থেকে শুনলাম তোমার এবং সাজ্জাদের মধ্যে লিগাল সেপারেশন হয়ে গেছে। আমি অবশ্য তার কথায় কোনো গুরুত্ব দেই নি। তোমার আপার স্বভাবই হলো অকারণে কথা বলা। যেখানে সমস্যা নেই সেখানে সমস্যা দেখা। ইদানীং তার ধারণা, আই অ্যাম ইন লাভ উইথ অ্যানাদার উওম্যান। সেই উওম্যানের সঙ্গে আমি বিছানা শেয়ার করছি। তোমার আপা এ ভেরি স্ট্রেঞ্জ ক্যারেক্টার।

দিলশাদ বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপা আমার ব্যাপারে ঠিকই বলেছে।

ঠিক বলেছে? বলো কী?

দিলশাদ লক্ষ করল ওয়াদুদুর রহমানের চোখ চক চক করছে। আনন্দের কোনো ঘটনা শোনার সময় মানুষের চোখ চক চক করে। এটা কি আনন্দের কোনো ঘটনা?

দিলশাদ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, আপা একটু বেশি বেশি বলেছে। সেপারেশন তো বটেই। ও থাকে এক জায়গায়, আমি থাকি আরেক জায়গায়। তার মানে কিন্তু ডিভোর্স না। তবে অনেক দিন থেকেই আমাদের সমস্যা হচ্ছে। আমরা মানিয়ে নিতে পারছি না। ঘৃণা পুষে একসঙ্গে বাস করছি। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে বাড়ি মাথায় তুলছি। লিগাল সেপারেশন হলে দুজনের জন্যেই ভালো। সব ভালো তো আর সবসময় হয় না। এখন যা হয়েছে তা হচ্ছে। মন্দের ভালো। দুলাভাই, এখন উঠি।

তোমার আপার কথা শুনে রাগ কর নি তো!

রাগ করব কেন? রাগ করার মতো কিছু তো বলেন নি।

আরো কিছুক্ষণ বসো। শালী-দুলাভাই গল্প তো কিছুই হলো না। নির্জন অফিস ঘর। শালী-দুলাভাই। এর মজাই অন্যরকম। হা হা হা। শোন দিলু, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার গাড়ি চলে আসবে। গাড়ি এলে আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। এই এক ঘণ্টা ইন্টারেস্টিং সব জোকস বলব।

দুলাভাই, আরেক দিন এসে আপনার জোকস শুনব। রসিকতা শোনার মতো মানসিক অবস্থা আমার না। তারপরেও শুনব। আজ আমাকে ছুটি দিন।

এখন কি বাসায় যাবে?

না। কলাবাগানে বাবার কাছে যাব। আপনার সাহায্য যেমন চাইলাম, বাবার কাছেও সাহায্য চাইব।

উনাকে তো তুমি আজ পাবে না। আজ বুধবার না? বুধবারে উনি তাঁর পীর সাহেবের কাছে যান। সারারাত মারফতি সব ব্যাপার হয়। বৃহস্পতিবারে তিনি ফিরে এসে ঝিম ধরে থাকেন। হা হা হা। সরি, শ্বশুরকে নিয়ে হাসাহাসি করছি! ঠিক হচ্ছে না। তাছাড়া ঐ পীর ব্যাটার কিছু ক্ষমতা আছে বলেও মনে হয়। এট লিস্ট থট রিডিং-ফিডিং জানে। ঐ দিন কী হয়েছে শোন। আমি আব্বার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গেলাম তার কাছে। কাছে গিয়ে বসতেই উনি আমাকে বললেন, বাবা, আপনার চামড়ার ব্যবসা কেমন হচ্ছে? আমি বলতে গেলে হতভম্ব।

আপনার কি চামড়ার ব্যবসা আছে?

আগে ছিল না, এখন শুরু করেছি। সেমি ফিনিশড লেদার এক্সপোর্ট করছি। পীর সাহেবের তো সেটা জানার কথা না, তাই না?

বাবার মতো আপনিও তাহলে উনার ভক্ত হয়েছেন?

কিছুটা তো হয়েছিই। আমি আবার অল্পতেই ভক্ত হয়ে যাই। তোমার প্রতি আমার ভক্তি যে কী পরিমাণে তা জানলে সর্বনাশ হয়ে যেত। এমন কোনো সপ্তাহ যায় না যে সপ্তাহে আমি তোমাকে স্বপ্নে না দেখি। কিছু কিছু স্বপ্ন আবার এক্স রেটেড। হা হা হা।

দুলাভাই, আমি যাই।

যাচ্ছ যাও। শুধু একটা কথা বলে দিয়ে যাও। এই বয়সেও বডি এরকম ফিট কী করে রাখ? তোমাকে দেখলে মনেই হয় না তোমার বয়স আঠার-উনিশের বেশি। তোমার আপাকে আমি প্রায়ই তোমার উদাহরণ দেই। লাভ হয় না কিছুই। কপকপ করে সারাদিন খায় আর থলথলা মোটা হয়। মোটা মেয়েমানুষ নিয়ে বিছানায় শোয়া যায়? বিদেশ হলে এতদিনে ডিভোর্স হয়ে যেত।

দিলশাদ কিছু বলল না। উঠে দাঁড়াল। দুলাভাইয়ের সব কথা সে ঠিকমতো শুনেও নি। আজকাল কী যেন হয়েছে, মন দিয়ে সে বেশিক্ষণ অন্যের কথা শুনতে পারে না।

ওয়াদুদুর রহমান খালি গায়েই শালীকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

.

দিলশাদ তার দুলাভাইয়ের অফিসে যখন গিয়েছিল তখন ঝলমলে রোদ ছিল। অফিস থেকে সে বের হয়েই দেখল আকাশ মেঘলা। বৈশাখ মাসের মেঘলা আকাশ ভালো না। হঠাৎ বাতাস দিতে শুরু করবে। দেখতে দেখতে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। নাতাশা ঝড় ভয় পায় না, বজ্রপাত ভয় পায়। বজ্রপাতের শব্দে আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ে। ছোটবেলায়

আকাশ অন্ধকার হলেই দুহাতে কান চাপা দিয়ে বসে থাকত। মেয়েকে একা রেখে এরকম দিনে কোথাও যাওয়া ঠিক না। দুলাভাইয়ের কথা অনুযায়ী বাবাকে বাসায় পাওয়াও যাবে না। বাবার বাড়িতে যাবার পরিকল্পনা বাতিল করে দিলশাদ নিজের বাসায় ফিরে যাওয়া ঠিক করে রিকশা নিল। রিকশায় চলতে শুরু করা মাত্র বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস। দিলশাদ মত বদলাল, বাবার বাড়িতে যাওয়া ঠিক করল। সে নিশ্চিত বাবাকে পাওয়া যাবে না। তার পরেও সে রিকশাওয়ালাকে বলল, কলাবাগানের দিকে যেতে। তার হঠাৎ করেই মার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। সে মনে মনে ঠিক করল, যদি বাবা বাসায় না থাকেন, শুধু মা একা বাসায় থাকেন, তাহলে সে মাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদবে।

.

হাদিউজ্জামান সাহেব বাসায় ছিলেন। বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে বসে বৃষ্টি দেখছিলেন। তার বসার মধ্যে কেমন জবুথবু ভাব। সম্প্রতি দাড়ি রাখা ধরেছেন। গালভর্তি ধবধবে সাদা দাড়ি। সাদা দাড়ি মানুষের চেহারা কোমল করে, তাকে করে নি। তাঁর মধ্যে আলদা কাঠিন্য চলে এসেছে।

দিলশাদ রিকশা থেকে নেমেই বাবাকে দেখল। তিনিও মেয়েকে দেখলেন। মনে হলো তিনি ঠিক চিনতে পারছেন না। তিনি ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দিলশাদ বলল, কেমন আছ বাবা?

তিনি মাথা নাড়লেন। সেই মাথানাড়া থেকে ভালো-মন্দ কিছু বোঝা গেল না। দিলশাদ বলল, ভেবেছিলাম তোমাকে পাব না। শরীর ভালো আছে?

হুঁ।

বাইরে বসে আছ কেন? বৃষ্টি দেখছ?

হাদিউজ্জামান সাহেব জবাব দিলেন না। মেয়ের মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। দিলশাদ বলল, দুলাভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম, উনি বললেন, আজ বুধবার, আজ নাকি তোমাকে পাওয়া যাবে না। বুধবারে পীর সাহেবের সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে।

আজ যাই নি, শরীরটা খারাপ।

শরীর খারাপ? কী হয়েছে?

সব মিলিয়ে খারাপ, আলাদা করে বলার কিছু না।

মা বাসায় আছে বাবা?

না। কার বিয়েতে যেন গেছে। দুপুর দুটার মধ্যে চলে আসার কথা। এখন সাড়ে চারটার মতো বাজে। এখনো আসছে না। বেকুব মেয়েছেলে। আসতে দেরি হবে বলে গেলেই হতো। দুটার মধ্যে চলে আসব বলার দরকার কী? কাজের মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এক কাপ চা যে খাব সে উপায় নেই।

আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি। তুমি দুপুরের খাওয়া খেয়েছ?

হাদিউজ্জামান সাহেব জবাব দিলেন না। দুপুরের খাবার তিনি খান নি, স্ত্রীর উপর রাগ করেই খান নি। মেয়েকে তা বলতে ইচ্ছা করছে না।

দিলশাদ বলল, মা'র জন্যেই কি তুমি বারান্দায় বসে আছ?

হাদিউজ্জামান সাহেব এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। কথা এমনিতেই তিনি কম বলেন। ইদানীং কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। নিজে তো কথা বলেনই না, অন্য কেউ কথা বললেও বিরক্ত হন।

দিলশাদ চা বানানোর জন্যে রান্নাঘরে চলে গেল। তার মা'র রান্নাঘর খুব গোছানো। একজন অন্ধও যদি রান্নাঘরে ঢুকে সে বলে দিতে পারবে কোথায় কী আছে। দিলশাদের ধারণা, তার মা'র রান্নাঘরের মতো পরিষ্কার ছিমছাম রান্নাঘর ঢাকা শহরে আর কারো নেই।

চা বানিয়ে দিলশাদ বারান্দায় চলে এলো। হাদিউজ্জামান সাহেব আগের মতোই বিরক্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। তিনি মেয়ের হাত থেকে অনাগ্রহের সঙ্গে চায়ের কাপ নিতে নিতে বললেন, নাতাশা কেমন আছে?

আগের মতোই আছে।

তোর মা'র কাছে শুনলাম ওকে বাইরে নিয়ে যাবার সবকিছু ফাঁইনাল হয়েছে।

হ্যাঁ।

ভিসা হয়েছে?

না।

মেয়ে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া তো বিরাট খরচান্ত ব্যাপার।

হ্যাঁ।

টাকা পয়সার ব্যবস্থা কী হয়েছে?

এর-তার কাছে চেয়ে-টেয়ে জোগাড় করছি।

ভিক্ষা?

দিলশাদ কঠিন গলায় বলল, ভিক্ষা না, ধার।

ধার শোধ করবি কীভাবে?

একটা ব্যবস্থা হবেই।

হাদিউজ্জামান সাহেব বিরক্তমুখে বললেন, ব্যবস্থা হবে বললেই তো আর ব্যবস্থা হয় না। তার জন্যে পরিকল্পনা থাকতে হয়। তোর পরিকল্পনাটা কী?

কোনো পরিকল্পনা নেই বাবা। ভাবার মতো সময় পাচ্ছি না। আমি যে কী পরিমাণে অশান্তিতে আছি তোমাকে বুঝাতে পারব না। রাতে ঘুমুতে পারি না। শেষরাতে ঘুমাই। ঘুমের মধ্যে কুৎসিত কুৎসিত সব স্বপ্ন দেখি। এত কুৎসিত যে ঘুমের মধ্যেই গা ঘিন ঘিন করে।

দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আমি পীর সাহেবের কাছে তোর মেয়ের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছি উনি বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই। দুরুদে শেফা বলে একটা দুরুদ আছে। তিনি তোকে ঐ দুরুদ এগার লক্ষবার পড়ে মেয়ের দুই চোখে ফুঁ দিতে বললেন। ফুঁ দেওয়ামাত্রই রোগ আরাম হতে শুরু করবে ইনশাল্লাহ। এই দুরুদ তোকেই পড়তে হবে, অন্যকেউ পড়লে হবে না। বুঝতে পারছিস?

হুঁ, এগার লক্ষবার একটা দুরুদ পড়া তো সহজ ব্যাপার না।

রোগটাও তত সহজ না। কাশি না যে কফ সিরাপ খাইয়ে দিবি। জটিল ব্যাধি।

এগার লক্ষবার পড়তে অনেক দিন লাগবে।

লাগলে লাগবে। তুই শুধু নিগেটিভ দিক নিয়ে ভাবছিস কেন? রাত-দিন খেটে দুরুদটা পড়ে ফেল। তারপর কোনো ইমপ্রুভমেন্ট না হলে মেয়েকে বাইরে নিয়ে যা।

আমি বাবা ওকে দ্রুত আমেরিকা নিয়ে যাব।

দুরুদ পাঠ শেষ হোক, তারপর নিয়ে যা।

আমার হাতে এত সময় নেই বাবা।

হাদিউজ্জামান সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোদের সবচে বড় সমস্যা হলো বিশ্বাসের সমস্যা। তোকে দোষ দিচ্ছি না। আমরা বাস করছি অবিশ্বাসের যুগে। আইয়েমে জাহেলিয়াতের সময় যে অবিশ্বাস ছিল এখন আবার আমরা সেই অবিশ্বাসের দিকেই যাচ্ছি। বড়ই আফসোসের কথা।

দিলশাদ নরম গলায় বলল, বাবা, আমি দোয়াটা পড়ব। অবশ্যই পড়ব। কিন্তু আমি দোয়া শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করব না।

হাদিউজ্জামান বিরক্ত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দিলশাদ নরম গলায় বলল, তুমি আমাকে এখন কিছু সাহায্য কর বাবা। আমি জানি তোমার কাছে টাকা আছে। বেশি না হলেও আছে। যা আছে তুমি আমাকে দাও। আমি তোমার প্রতিটি টাকা গুনে গুনে ফেরত দেব।

কোত্থেকে দিবি?

দরকার হলে পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করব।

নাটক নভেলের মতো কথা বলছিস কেন? বাস্তব কথা বল। ফট করে বলে ফেললি পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করবি? ভিক্ষা করা এতই সহজ?

খুব কঠিনও না। এখন তো ভিক্ষাই করছি। বাবা, তুমি বলো তোমার কাছে কত টাকা আছে। যা আছে সব তুমি আমাকে দিয়ে দাও। কত আছে তোমার সেভিংস অ্যাকাউন্টে?

হাদিউজ্জামান সাহেব মেয়ের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন। মেয়ের উপর তার কোনো মমতা হচ্ছে না। রাগ লাগছে। বিপদ-আপদ মানুষের আসে। সেই বিপদ সামলাবার চেষ্টা করতে হয়। সাহসের সঙ্গে করতে হয়। মাথা নিচু করে বিপদ মোকাবেলা করা যায় না, মাথা উঁচু করে করতে হয়। তার উপর মেয়ের অবিশ্বাসও তাকে কষ্ট দিচ্ছে। বারবার জানতে চাচ্ছে ব্যাংকে কত আছে। আশ্চর্য!

সেভিংস অ্যাকাউন্টে তার আছে দুই লক্ষ তিন হাজার সাত শ' তের টাকা। এটা গত মাসের হিসাব। ইন্টারেস্টে এক মাসে কিছু বেড়েছে। তিনি দিলশাদের নামে দুই লক্ষ টাকার একটা চেক কেটে রেখেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা ছিল দুজনে মিলে চেকটা মেয়ের হাতে দিয়ে আসবেন। এতে মেয়ে অনেকটা সাহস পাবে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বিপদে অর্থ যে সাহস দেয় অন্য কিছু সেই সাহস দিতে পারে না।

হাদিউজ্জামান উঠলেন। আসরের নামাজের সময় হয়ে আসছে। অজু করা দরকার। তিনি দিলশাদকে বললেন, একটু বোস, আমি নামাজটা পড়ে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না।

দিলশাদ শুকনো মুখে বারান্দায় বসে রইল। ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে। নাতাশার জন্যে তার খারাপ লাগছে। সে ভয় পাবে কিন্তু ফুলির মাকে ডাকবে না। একা একা কষ্ট পাবে। দিলশাদ ঘড়ি দেখল। দুটা বাজে। ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে। বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। কোনো অলক্ষণ কি? ঘড়ি কেন বন্ধ হবে? সেদিন মাত্র নতুন ব্যাটারি কেনা হলো।

হাদিউজ্জামান সাহেব নামাজ শেষ করতে অনেক সময় নিলেন। তিনি বারান্দায় এলেন চেক হাতে নিয়ে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটাকে এই টাকাগুলো দেয়ার তার ইচ্ছা ছিল। দেয়া হলো না। মনোয়ারা তার মেয়ের আনন্দিত মুখ দেখতে পেল না। এটা একদিকে ভালোই হয়েছে। মনোয়ারার জন্যে উচিত শাস্তি। কেন সে দুপুরে ফেরার কথা বলে এখনো ফিরছে না? তিনি না খেয়ে বসে আছেন। একা একা তিনি খেতে পারেন না। তার খাওয়ার সময় মনোয়ারাকে সামনে থাকতে হয়।

দিলু!

জি বাবা।

নে মা। এই চেকটা রাখ। দুই লাখ টাকার চেক। এখন ভাঙাবি না। ভাঙালে খরচ হয়ে যাবে। সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক, জমা দেবার আগে আমাকে বলবি। আমি ব্যাংক ম্যানেজারকে চিঠি দেব। আমার চিঠি ছাড়া এতগুলি টাকা তারা রিলিজ করবে না।

দিলশাদ চেক হাতে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ ভিজে আসছে। বাবা না হয়ে মা যদি চেকটা তাকে দিত তাহলে সে হয়তো চিৎকার করে কেঁদে একটা কাণ্ড করে বসত।

হাদিউজ্জামান সাহেব বললেন, সেভিংস অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে জানতে চাচ্ছিলি– দুই লক্ষ তিন হাজার সাতশ’ তের টাকা আছে। তিন লক্ষ টাকা ছিল, গ্রামের স্কুলে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করেছি। ওরা একটা লাইব্রেরি বানিয়েছে। তখন তো আর জানতাম না তোর এতবড় বিপদ হবে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

দিলশাদের চোখ বেয়ে পানির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে। হাদিউজ্জামান। সাহেব বললেন, বিপদে অস্থির হবি না। অস্থির হলে বিপদ কমে না। বিপদ বাড়ে। আরেকটা কথা তোকে বলি– টাকা-পয়সা যদি জোগাড় না হয় অস্থির হবি না। ভাববি এটাও আল্লাহর ইশারা। আল্লাহর ইশারা ছাড়া জগতে কিছু হয় না। তোর মেয়েকে আমার রোজ দেখতে যেতে ইচ্ছা করে। তোরা বাসা নিয়েছিস তিনতলায়। ডাক্তার আমাকে তিন ধাপ সিঁড়ি ভাঙতেও নিষেধ করেছে। ইচ্ছা করলেও যেতে পারি না। তোর মাকেও আমি তোর বাসায় যেতে নিষেধ করেছি। তার বিশ্রী কাঁদুনি স্বভাব আছে। সে নাতাশাকে দেখলেই এমন কান্নাকাটি শুরু করবে যে তোর মেয়ে ভয় পেয়ে যাবে। তার মনোবল যাবে ভেঙে। এই অবস্থায় মনোবল ভাঙা খুব খারাপ।

বাবা আমি যাই?

আচ্ছা মা, যাও।

যাই বলেও দিলশাদ দাঁড়িয়ে থাকে। তার ইচ্ছা করছে বাবাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। মনে হচ্ছে বাবাকে ছোঁয়ামাত্র বাবার ভেতর থেকে অনেকখানি সাহস তার ভেতর চলে আসবে। কিন্তু বাবার সঙ্গে তার দূরত্ব অনেক বেশি। হাজার ইচ্ছা করলেও বাবাকে সে ছুঁতে পারবে না, কিংবা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারবে না। হাদিউজ্জামান সাহেব দিলশাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যাই বলেও মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোরা সবসময় ইনডিসিশনে ভুগিস– এটা আমার অসহ্য লাগে।

৪. দুপুরে ঘুমুচ্ছিলাম

দুপুরে ঘুমুচ্ছিলাম। ঘুমের মধ্যেই মনে হলো দারুণ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। খুব : আনন্দময় কিছু। আমার এরকম প্রায়ই হয়। আমরা একবার নানিজনদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। মা নানিজান দুজনে মিলে এমন গল্প শুরু করলেন, সাড়ে এগারটা বেজে গেল। নানিজান বললেন, এতরাতে বাসায় ফিরে কী করবি? থেকে যা। আমরা থেকে গেলাম। নানিজানদের বাড়িতে বিছানার খুব অভাব। আমি, নানিজান আর মা আমরা তিনজন এক বিছানায় শুয়েছি। বালিশে মাথা ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম চলে এলো। ঘুমের মধ্যে মনে হলো, আমাদের খুব খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর কোনো সংবাদ নিয়ে কেউ একজন আসছে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি, মা আর নানিজান তখনো মজা করে গল্প করছেন। খুব হাসাহাসি হচ্ছে। নানিজান বাচ্চামেয়েদের মতো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছেন। আমাকে জেগে উঠতে দেখে নানিজান হাসিমুখে বললেন, কী রে নাতু, ছোট ঘর যাবি? নানিজান আমাকে 'নাতু' ডাকেন। নাতাশা নামটা নাকি তার কাছে অনেক লম্বা লাগে। ডাকতে গিয়ে দম ফুরিয়ে যায়।

আমি বললাম, ছোট ঘরে যাব না, পানি খাব নানিজান।

নানিজান পানি আনার জন্যে উঠতে যাচ্ছেন, মা বললেন, তুমি বসো তো মা, আমি পানি এনে দিচ্ছি। আর ঠিক তখন কলিংবেল বেজে উঠল। আমি নিশ্চিত বুঝলাম খারাপ খবরটা এসে গেছে। আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। এত রাতে মা দরজা খুলতে গেলেন না। নানাভাই জেগে ছিলেন, তিনি উঠে দরজা খুললেন। মা গেলেন নানাভাইয়ের পিছু পিছু। মা'র সঙ্গে আমিও গেলাম।

বুড়ো মতো ভিখিরী ধরনের এক ভ্দ্রলোক দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। এত নিচু গলায় বললেন যে, কেউ কিছু বুঝতে পারল না। নানাভাই বিরক্ত গলায় বললেন, কী বলছেন জোরে বলুন। কিছু বুঝতে পারছি না। আপনার গলায় জোর নাই।

বুড়ো দ্রলোক তখন আমার ছোট মামার মৃত্যুসংবাদ দিলেন।

কতদিন আগের কথা, এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। কথা বলার সময় বুড়ো ভদ্রলোকের মুখ থেকে থুথু ছিটকে আসছিল। সেই থুথুর খানিকটা এসে তাঁর দাড়িতে লাগল। দাড়ির মাথায় শিশিরের মতো থুথুর বিন্দু চিকচিক করতে লাগল। সেই থুথু আমি এখনো চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দেখতে পাব।

বেশিদিন অবশ্যি আমি বেঁচে থাকব না। আর খুব অল্পদিনই বাঁচব। এটা মা জানে না। আমি জানি। এবং খুব সম্ভব আমার ডাক্তার সাহেব জানেন। মা পুরোপুরি নিশ্চিত চিকিৎসা-টিকিৎসা করে আমাকে সুস্থ করে ফেলবে। তখন আমি আবার আগের মতো হয়ে ছোটাছুটি শুরু করব। আমার অপারেশনের ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে। এখন শুধু টিকিট কেটে প্লেনে ওঠা। ও না, ভিসা এখনো হয় নি। ভিসা নিয়ে মা খুব চিন্তা করছে। আমেরিকান অ্যাম্বেসি নাকি কাউকে ভিসা দিচ্ছে না। ভিসার চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টাকার চিন্তা। টাকা জোগাড় করার জন্যে মা প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছে। তার মাথা এলোমেলো। সেদিন সন্ধ্যাবেলা শুনি গুন গুন করে আপন মনে গান গাইছেন– ‘খোল খোল দ্বার রাখিও না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।

আমি অবাক হয়ে মাকে দেখছি। কারণ তাঁকে আমি এভাবে কখনো গান গাইতে শুনি নি। মা আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব লজ্জা পেয়ে গেলেন। আমি বললাম, মা, তুমি সুন্দর গান গাও তো। মা আরো লজ্জা পেলেন। বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। এতটা লজ্জা পাওয়ার মার কিছু ছিল না। ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে আমরা সবাই অস্বাভাবিক আচরণ করি। ছোট মামার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে বুড়ো ভদ্রলোক যখন এলেন তখন আমার নানাভাইও খুব অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলেন। বুড়ো ভদ্রলোককে বললেন, শুধু-মুখে যাবেন না। পান খেয়ে যান।

বাড়িতে তখন ভয়ঙ্কর কান্নাকাটি চলছে। নানাভাই এর মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পান খোঁজাখুজি করছেন। আমি অবাক হয়ে নানাভাইয়ের কাণ্ড দেখছি। আমার ধারণা, সেদিন থেকেই নানাভাইয়ের মাথা কিছু কিছু খারাপ হতে শুরু করেছে। কেউ বুঝতে পারে নি। আমি কিন্তু বুঝেছি।

আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি। এই যে ঘুমের মধ্যে মনে হলো আজ খুব ভালো কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত, আসলেই তা ঘটবে। কেউ বাজি ধরতে চাইলে আমি বাজি ধরতাম, এবং নির্ঘাৎ বাজিতে জিততাম।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজার কলিংবেল বাজতে লাগল। সেই ভালো কিছুটা কি এক্ষুনি ঘটবে? বাবা কি এসেছেন? কিংবা বাবার কোনো চিঠি? আমার শরীর যেন কেমন কেমন করছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে আমি পড়ে যাব। বুয়া দরজা খুলতে এত দেরি করছে কেন?

আমাদের বুয়া সব কাজ ঝটপট করে, শুধু কলিংবেল বাজলে দরজা খুলতে দেরি করে। মনে হয় কলিংবেলের শব্দ অনেক পরে তার কানে যায়। শব্দের গতিবেগ যেন কত? স্কুলে পড়েছিলাম। এখন আর মনে পড়ছে না। আলোর গতিবেগ মনে আছে সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে- শব্দের গতিবেগ হলো প্রতি সেকেন্ডে তিনশ বত্রিশ মিটার। এক ফুট সমান ৩০.৪৮ সেন্টিমিটার।

আবার কলিংবেল বাজছে। বুয়া এখন যাচ্ছে। এত আস্তে আস্তে পা ফেলছে, মনে হচ্ছে পায়ের তলায় কোনো ফোড়া-টোড়া হয়েছে। পা ফেলতে খুব কষ্ট।

দরজা খুলল। কার সঙ্গে যেন কথা হচ্ছে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আবার দরজা বন্ধ হলো। আমি বললাম, কে এসেছিল? বুয়া বলল, কেউ না।

এটা কোনো জবাব হলো? কেউ না আবার কী? কেউ একজন তো নিশ্চয়ই এসেছে।

তুমি কার সঙ্গে কথা বললে?

উকিল সাবের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে। আমি বলছি জানি না।

জানি না বললে কেন? উকিল সাহেবের বাড়ির ঠিকানা তো তুমি জানো। আমাদের ফ্ল্যাটের সামনের বকুল গাছওয়ালা বাড়িটা উকিল সাহেবের বাড়ি।

যার দরকার হে খুঁইজা বাইর করুক।

খোঁজ করে তো সে পাচ্ছে না। তুমিও তাকে বলছ না।

আমার অত ঠেকা নাই। কিছু খাইবেন আফা। শীতল পানি।

আমাদের বুয়া মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ ব্যবহার করে। ঠাণ্ডা পানি বলে না, বলে শীতল পানি। দৈ বলে না, বলে দধি। রুই মাছকে বলে রুহিত মাছ।

আফা, শীতল পানি আনমু?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম। আমার আসলেই পানির পিপাসা হচ্ছে। বুয়া উৎসাহের সঙ্গে শীতল পানি আনতে চলে গেল। এখন আর তার পায়ের তলায় ফোড়া নেই। সে প্রায় দৌড়ে যাচ্ছে।

মা আমার পানি খাওয়ার জন্যে একটা ফ্রিজ কিনেছেন। সেই ফ্রিজ জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে দেয়া হয়েছে। ছোট্ট লাল টুকটুকে একটা ফ্রিজ। মা'র টাকা পয়সার এত টানাটানি, এর মধ্যে ফ্রিজ কিনল কেন? আমাকে অনেকখানি খুশি করে দেওয়ার জন্যে? যাই হোক, আমাকে সেই ফ্রিজের পানি খাওয়ানোর ব্যাপারে বুয়ার খুব উৎসাহ।

বালিশের নিচ থেকে আমি আমার অ্যালার্ম ঘড়ি বের করলাম। সময় দেখলাম। তিনটা পঁচিশ। ঘড়িটাও আমি জন্মদিনে পেয়েছি। বড়খালা দিয়েছেন। ঢাকনা দেওয়া একটা ঘড়ি। ঘড়িটার ঢাকনার রঙও লাল টুকটুকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এবারের জন্মদিনে আমি সব লাল রঙের জিনিস পেয়েছি। নিজান। আমাকে কামিজ কিনে দিয়েছেন। সেটার রঙও লাল। আমার স্কুলের মেয়েরা আমাকে একটি চকলেট আর বড় রঙ পেন্সিলের বাক্স দিয়েছে। পেনসিল বক্সে দুটা লাল রঙের ঘোড়া আঁকা।

আমার জন্ম ৩রা বৈশাখ। আমার জন্মের পর পর দাদাজানের কাঁঠাল গাছ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখি উড়ে গিয়েছিল। এই দৃশ্য আমি দেখি নি, কিন্তু আমার কল্পনা করতে খুব ভালো লাগে। প্রতি জন্মদিনের ভোরবেলায় আমার মনে হয়- আজ কোনো একটা গাছ থেকে একঝাক টিয়া পাখি আকাশে উড়বে।

এ বছর আমার জন্মদিন করার কথা ছিল না। মা বললেন, অসুখ-বিসুখের মধ্যে জন্মদিন ভালো লাগবে না। রোগ সারুক, তারপর আমরা দারুণ হৈচৈ করে জন্মদিন করব। বিরাট একটা পার্টি দেব। ঠিক আছে মা? আমি বললাম, আচ্ছা।

মানুষ যেরকম ভাবে সেরকম হয় না। জন্মদিনের দিন সকাল থেকে এত মানুষ আসা শুরু করল। উপহারে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। মার মুখ থমথমে হয়ে গেল। মা চাপা গলায় নানিজানকে বললেন, তোমরা কি ভেবেছ এটা আমার মেয়ের শেষ জন্মদিন? তোমাদের কাউকে আমি আসতে বলি নি। কেন তোমরা এত কিছু নিয়ে এসেছ? তোমরা যা ভাবছ তা হবে না। আমি আমার মেয়ের একশ বছরের জন্মদিন করব। নানিজান হাসিমুখে বললেন, একশ বছরের জন্মদিন তুই করতে পারবি না। তুই এতদিন বাঁচবি না। অন্যরা করবে।

মা কাঁদতে শুরু করলেন। নানিজান মা'র পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, নাতুকে নিয়ে তুই অনেকদিনের জন্যে বিদেশে চলে যাবি, কতদিন তাকে দেখব না। কাজেই একটা উপলক্ষ ধরে আমরা এসেছি। তুই এত রাগ করছিস কেন? নাতুর মাথার টিউমারের চেয়ে বড় টিউমার তো তোর মাথায় হয়েছে রে। আমেরিকা থেকে তুইও একটা অপারেশন

করিয়ে আসিস। নানিজান মাথা দুলিয়ে খুব হাসতে লাগলেন। মা হেসে ফেললেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেল।

আমার নানিজান অসাধারণ একজন মহিলা। যখনি তাকে দেখি তখনি তিনি হাসছেন এবং এত মিষ্টি করে হাসছেন। যার অন্তর যত সুন্দর সে নাকি তত সুন্দর করে হাসে। যদি তাই হয় তাহলে নানিজানের মতো সুন্দর অন্তর আর কারো নেই।

তিনি এসেই বললেন, এই নাতু, শুয়ে থাকবি না তো। উঠে বোস। রোগী শুয়ে থাকলে রোগ বসে থাকে। আর রোগী উঠে বসলে রোগ শুয়ে পড়ে।

আমি উঠে বসলাম। নানিজান আমার পেছনে বালিশ দিয়ে দিলেন। তারপর শুরু করলেন হাসির এক গল্প। গল্প বলবেন কী, নিজেই হাসতে হাসতে বাঁচেন না। এক লাইন বলেন, বলেই হাসেন। আরো এক লাইন বলেন, আবারো হাসি। এমন হাসাহাসি শুরু হলো যে, কে বলবে এ বাড়িতে কোনো অসুখ-বিসুখ আছে! আমি অনেকদিন পর মাকে প্রাণ খুলে হাসতে দেখলাম। আর একটা জিনিস লক্ষ করলাম, একটু পর পর মা এসে নিজানকে ছুঁয়ে যাচ্ছেন। কখনো হাত ধরে বসে থাকেন, কখনো গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসেন। একসময় নানিজান ধমকের মতো করে বললেন, তুই তো বড় যন্ত্রণা করছিস! শুধু গায়ের সঙ্গে গা ঘসাচ্ছিস। এমনিতেই গরমে মরে যাচ্ছি।

সামান্য কথা। এতেও আবার সবাই হাসতে শুরু করল। নিজান একটা হাসির বড় ঝাড়বাতি জ্বেলে চলে গেলেন। তিনি আরো কিছুক্ষণ থাকতেন, কিন্তু তাকে যেতেই হবে, কারণ নানাভাই বাসায়। তিনি না গেলে নানাভাই ভাত খাবেন না। রাগ করে বসে থাকবেন। নানাভাই আবার নানিজান পাশে না থাকলে ভাত খেতে পারেন না।

বিকেলে আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার ক্লাসের মেয়েরা এলো। তাদের নিয়ে এলেন আমাদের অঙ্ক-মিস-শাহেদা আপা। স্কুলে আমাদের এই অঙ্ক-মিসের নাম হলো শুকনা বাঘিনী’। আমাদের স্কুলে দুজন বাঘিনী আছেন। একজন হলেন থলথলা বাঘিনী, অন্যজন শুকনা বাঘিনী। আমরা সবচে’ বেশি ভয় পাই শুকনা বাঘিনীকে। স্কুলের বারান্দা দিয়ে তাকে হেঁটে যেতে দেখলে আমাদের পানির পিপাসা পেয়ে যায়। তিনি যে আমার জন্মদিনে চলে আসবেন আমি চিন্তাও করি নি। তাকে দেখে আগের অভ্যাস মতো ভয়ে আমার পানির পিপাসা পেয়ে গেল। তিনি আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে অবাক গলায় বললেন, মা রে, তোর এই অবস্থা কেন হলো? বলেই কাঁদতে শুরু করলেন। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেরকম শব্দ করে কাঁদে সেরকম শব্দ করে কান্না। তারপর তিনি ছুটে বারান্দায় চলে গেলেন। বারান্দা থেকে তার কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

বাইরে থেকে দেখে একটা মানুষ কেমন তা বোঝা আসলে খুব কঠিন। আমাদের শুকনা বাঘিনী আপা আসলেই বাঘিনী। দয়া-মায়ার ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে নেই। আদর করে কাউকে তিনি কোনো কথা বলেছেন বলে কেউ শুনে নি। পরীক্ষার হলে নকল করে কোনো মেয়ে ধরা পড়লে অবশ্যই তিনি তাকে এক্সপেল করে দেবেন। কেঁদে চোখ গালিয়ে ফেললেও কোনো লাভ হবে না। তবে কারো অসুখ-বিসুখ হলে অন্যকথা। আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন মনিকা একদিন ক্লাসে এলো জ্বর নিয়ে। বাঘিনী আপা অঙ্ক পড়াতে এসে টের পেলেন। কঠিন গলায় বললেন, কী রে, তোর চোখ লাল কেন? জ্বর-জারি নাকি?

মনিকা ভয়ে নীল হয়ে বলল, জি-না আপা।

দেখি কাছে আয়।

মনিকা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেল। আপা কপালে হাত দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে। উঠলেন, গায়ে তো ভালো জ্বর। জ্বর নিয়ে এসেছিস কেন? বিদ্যা ধুয়ে খাবি? যা, টিচার্স কমনরুমে বেঞ্চ আছে, ওখানে গিয়ে শুয়ে থাক। আমি ক্লাস শেষ করে আসছি।

টিফিন পিরিয়ডে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম মনিকা বেঞ্চে শুয়ে আছে আর বাঘিনী আপা তার মাথা টিপে দিচ্ছেন। কত বিচিত্র ধরনের মানুষ যে পৃথিবীতে আছে! আশ্চর্য! একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের চেয়ে এত আলাদ সব মানুষ একরকম হলে কেমন হতো কে জানে। যখন কারো জ্বর হবে, সবার একসঙ্গে হবে। কারো আনন্দের কিছু ঘটলে সবারই ঘটবে। এইসব বিচিত্র কথা আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয়। আমি বাবাকে দেখাবার জন্যে মোটা একটা খাতায় লিখে রাখি। আমি জানি বাবা সেই খাতা দেখে খুব হাসাহাসি করবে। তবে হাসাহাসি করলেও বাবার কাছে খুব ভালো লাগবে। তবে মা ভুরু কুঁচকে বলবে– পাগলের মতো এইসব কী লিখেছিস? খাতাটা আমি কাউকে দেখাব কি-না তা এখনো ঠিক করি নি। মনে হয় শেষপর্যন্ত দেখাব না। খাতাটাতে এমন অনেক কিছু লেখা আছে যা পড়লে মা মন খারাপ করবে। আমি বেঁচে থাকলে অবশ্যি মন খারাপ করবে না। আমি বেচে থাকব না এইজন্যেই মন খারাপ করবে। যেমন আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে কি তার ডায়েরির এত নাম-ধাম হতো? আমার মনে হয় না। বেচারি নাজিদের হাতে শেষপর্যন্ত মারা গেছে বলেই তার ডায়েরি পড়ার সময় আমাদের এত খারাপ লাগে।

ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবার পর উপহার হিসেবে আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরিটা আমি পেয়েছিলাম। মেজোখালা দিয়েছিলেন। আমার বৃত্তি পাওয়া উপলক্ষে

আমাদের বাসায় ছোটখাটো একটা পার্টির মতো হলো। সবাই আমার জন্যে নানান উপহার-টুপহার নিয়ে এলেন। ছোটখালা আনলেন আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি। র‍্যাপিং পেপারে খুব সুন্দর করে মুড়ে, মোড়কের উপর কাগজের ফুল লাগিয়ে উপহারটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমি আর তোর মেজোখালু তোর উপহার কেনার জন্যে নিউমার্কেট চষে ফেলেছি। কিছুই পছন্দ হয় না। শেষে এই বইটা পেলাম। মনে হচ্ছে তোর ভালো লাগবে। অসাধারণ একটা মেয়ের অসাধারণ কাহিনী।

আমার মেজোখালা এবং খালু দুজনই খুব কৃপণ ধরনের মানুষ। নিজেদের জন্যে তারা প্রচুর খরচ করবেন। ঐ তো কিছুদিন আগে আরেকটা গাড়ি কিনলেন। কিন্তু অন্যের জন্যে একটা পয়সাও তাঁরা খরচ করবেন না। সেই মেজোখালা উপহার এনেছেন? আমার খুব ভালো লাগল।

মোড়ক খুলে বই বের করে আমি খুব খুশি। হঠাৎ দেখি বইয়ের ভেতরের পাতার এক কোনায় লেখা- পাপিয়া রহমান, ক্লাস নাইন, সেকশান বি। পাপিয়া মেজোখালার মেয়ে। এখন শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করছে। আমি তখন বোকার মতো একটা কাজ করে ফেললাম। আমি বললাম, খালা, এটা তো পাপিয়া আপার বই। তার নাম লেখা। তখন একটা বিশ্রী অবস্থা হলো। মেজোখালা চোখ-মুখ লাল করে বলতে লাগলেন, বইটা তিনি আমার জন্যেই কিনেছেন। পাপিয়া এক ফাঁকে নিজের নাম লিখে ফেলেছে।

আমার বড়খালু মানুষকে লজ্জা দিয়ে খুব আনন্দ পান। তিনি আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, পাপিয়া আম্মুর তো খুব বুদ্ধি। শুধু যে নিজের নামই লিখেছে তা না, আবার ব্যাক ডেট দিয়েছে। তিন মাস আগের তারিখ লেখা। হা হা হা।

মেজোখালা বললেন, দুলাভাই, আপনার কি ধারণা নাতাশার জন্যে নতুন একটা বই কেনার সামর্থ্যও আমার নেই?

বড়খালু বললেন, আমি কি বলেছি বই কেনার সামর্থ্য তোমার নেই? অবশ্যই আছে। আমি শুধু ব্যাকডেটের কথা বললাম। তোমার মেয়ের বুদ্ধির তারিফ করলাম। আমার ধারণা, পাপিয়া বড় হলে তোমার চেয়েও ইন্টেলিজেন্ট হবে। অবশ্যই সে তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে।

মেজোখালা কাঁদতে শুরু করলেন। কিছু না খেয়েই আমাদের বাসা থেকে চলে গেলেন। আমার কী যে খারাপ লাগল। আমি নিজেও বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমি কেন বোকার মতো এই কাজটা করলাম? কেন খালাকে এমন লজ্জা দিলাম? আমাদের বাংলা মিস, মিস রোকেয়া একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, গুরু নানকের একটা কথা আছে— তোমরা সবাই কথাটা খাতায় লিখে ফেল। কথাটা হচ্ছে– 'দু গুণা দত্তার চৌগুণা জুজার।' কথাটার মানে হচ্ছে দু গুণ দিলে চার গুণ ফেরত পাওয়া যায়। তুমি যদি কাউকে দু গুণ আনন্দ দাও তাহলে চার গুণ আনন্দ ফেরত পাবে। আবার কাউকে দু গুণ কষ্ট দিলে চার গুণ কষ্ট ফেরত পাবে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি কথাটা সত্যি। তোমরাও পরীক্ষা করে দেখো।

আমাদের ক্লাসের মলিনা গোমেজ খুব বোকা। আমার ধারণা, খৃস্টানরা বুদ্ধিমান হয়। মলিনা খৃস্টান হলেও দারুণ বোকা। সব ক্লাসেই সে বোকার মতো একটা প্রশ্ন করবে। মলিনা রোকেয়া আপাকে বলল, মিস, আপনি যদি আমাকে মারেন তাহলে কেউ কি আপনাকে ডাবল করে মারবে?

রোকেয়া আপা কখনো কারো কথায় রাগ করেন না। মলিনার কথা শুনে তার ভুরু কুঁচকে গেল, তবে তিনি রাগ করলেন না। শুধু বললেন, হ্যাঁ।

মলিনা বলল, এইজন্যেই কি আপনি আমাদের মারেন না?

ক্লাসের সবাই হাসতে লাগল। মিস রোকেয়া ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি স্পষ্ট বুঝলাম আপার মন খারাপ হয়েছে। গুরু নানকের চমৎকার একটা কথা তিনি বলেছেন। অথচ কথাটার গুরুত্ব কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই হাসাহাসি করছে।

সেই দিনই গুরু নানকের কথাগুলি আমি আমার ডায়েরিতে লিখে ফেললাম এবং ঠিক করলাম কথাগুলি সত্যি কি-না আমি পরীক্ষা করে দেখব। কারো মনে কষ্ট দিলে সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরিতে দিন-তারিখ দিয়ে লিখে ফেলব। তারপর মিলিয়ে দেখব আমি ডাবল কষ্ট পাই কি-না।

মেজোখালাকে লজ্জা দেয়ার ব্যাপারটা আমি খুব গুছিয়ে লিখলাম। কতদিন পরে আমি ডাবল লজ্জা পাই সেটা দেখার জন্যে। লেখার ছদিনের দিন আমি লজ্জা পেলাম। সে যে কী ভয়ঙ্কর লজ্জা! কাউকে সে লজ্জার কথা কোনোদিন বলা যাবে না। ডায়েরিতেও লিখে রাখা যাবে না। গুরু নানকের কথা এত সত্যি! আমি এখন থেকে ঠিক করেছি কাউকে কখনো কষ্ট দেব না, লজ্জা দেব না। এমন কিছু করব যাতে মানুষ খুশি হয়। তারা খুশি হলে কোনো না কোনো ভাবে আমি ডবল খুশি হব।

আমার জন্যে মানুষকে খুশি করা বেশ কঠিন। কারো সঙ্গে আমার দেখাই হয় না। আমার বন্ধুবান্ধব নেই। স্কুল থেকে ফিরে সারাদিন আমি ঘরেই বসে থাকি। বই পড়ি কিংবা

ডায়েরি লিখি। গল্পগুজব যা করার ফুলির মা'র সঙ্গে করি। সে কিছুতেই খুশি হয় না। তাকে খুশি করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তার গল্প শোনা। ফুলির মা সাধারণ কোনো গল্প জানে না। তার সব গল্পই ভয়ঙ্কর। শুনলে হাত-পা কাঁপে। অথচ সে এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে যেন ঠাকুমার ঝুলি থেকে লালকমল নীলকমলের গল্প বলছে।

বুঝছেন আফা, আমি তখন নয়া বাসার কামে ঢুকছি। আমার গেরাম সম্পর্কে চাচা আমারে নারায়ণগঞ্জের এক ফেলেটে কামে ভর্তি করছে। বাসার সাব ব্যাংকের অবিছার। পাঁচটা ডাংগর পুলাপান। পরথম দিন কাম করতে করতে জেবন শেষ। তিন বালতি কাপড় ধুইছি। ঘর মুছছি, দুনিয়ার বেবাক পাতিল মাজছি। রাইত একটার সময় চুলা বন কইরা ঘুমাইতে গেছি। ঘুমানির জইন্যে একটা পাতলা চাঁদর দিছে, আর দিছে একটা বালিশ। কী যে গরম ছিল আফা! গরমে শইল সিদ্ধ হইতাছে। গরমের সাথে সামিল হইছে মশা। হায় রে আষা কী কমু, ভোমরার লাহান বড় বড় মশা। আমার চউক্ষে নাই নিদ্রা। এই গোন দেই, হেই গড়ান দেই– মশা খেদাই। শেষ রাইতে চউখ একটু বন হইছে, হঠাৎ মনে হইল শাড়ি ধইরা কে জানি টানে। ইয়া মাবুদ! ধড়ফর কইরা উইঠা দেখি বাড়ির সাব। চিক্কর দিতে গেছি, ধরছে মুখ চাইপ্যা। এর মইধ্যে শাড়ি খুইল্যা লেংটা বানাইয়া ফেলছে...।

চুপ কর ফুলির মা। আমি আর শুনব না।

না শুননই ভালো। তুমি পুলাপান মানুষ। এই গুলান পুলাপানের গফ না।

পুলাপানের গল্প না হলেও ফুলির মা'র সব গল্পই আমাকে শুনতে হয়েছে। হয়তো গল্পের বই পড়ছি মা অফিসে, বাবা গেছেন কাজে। ফুলির মা তার কাজ শেষ করে এসে বসবে

আমার কাছে। তার হাতের মুঠোয় লুকানো জ্বলন্ত সিগারেট। ফুলির মা আমার সামনে সিগারেট খেলেও খুব সমীহ করে খায়। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে টান দেয়।

কী করেন গো আফা?

কিছু করি না।

মজার একটা ইতিহাস স্মরণে পাইছি। বড়ই ইন্টারেস্টের ইতিহাস। ভাত রানতে রানতে স্মরণ হইছে। একলা একলা হাসছি। ভাবলাম আফারে বলি। হইছে কী আফা– এক বড়লোকের বাড়িত কাম পাইছি। বাড়ির বেগম সাব পরীর লাহান সুন্দর। বেগম সাবের কাছে গাইয়ের দুধ আনলে দুধরে কালা লাগে। এমন শইলের রঙ। আর আমারে দেহেন আফা গাছের পেত্নি। তয় শইলটা ভালো। তা আফা খাটাখাটনির শইল ভালো তো হইবই! আমরার সম্বল হইল শইল,..।

এই গল্প শুনব না।

আচ্ছা থাউক, শুননের দরকার নাই। এইটা পুলাপানের গফ না।

তারপরেও ফুলির মা বুয়ার অনেক গল্প আমি শুনেছি। তার কয়েকটা আমি ডায়েরিতে লিখে রেখেছি। মা পড়লে ফুলির মা'র উপর রাগ করবে। খুব রাগ করবে। তবে আমি নিজে থেকে পড়তে না দিলে মা আমার ডায়েরি পড়বে না। এইসব ব্যাপারে মা খুব সাবধান। অবশ্যি আমার মৃত্যুর পর মা সব পড়বে। পড়বে আর কাদবে। সবচে বেশি কাঁদবেন বাবা। কারণ মেয়েরা অনেক শক্ত ধরনের হয়। ছেলেরা তা হয় না। বাইরে থেকে

তাদের শক্ত মনে হলেও আসলে তারা তা না। ছোট মামার মৃত্যুর শোক নানিজান সামলে উঠেছেন। নানাভাই সামলাতে পারেন নি। বাবার বেলাতেও তাই হবে। কাজেই আমাকে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যেন আমার মৃত্যুর পর কেউ আমার ডায়েরি পড়তে না পারে। ঘরে যেন আমার কোনো ছবিও না থাকে। ছবি থাকলেই আমার কথা সবার মনে পড়বে। ছবি দেখে দেখে কাদবে। হয়তো আমার আরেকটা ভাই হবে। কিংবা বোন হবে। ঈদের দিন ওরা কত আনন্দ করতে চাইবে। তখন মার মনে পড়ে যাবে আমার কথা। মা সব ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে বসবে। আমার বেচারা ভাইবোনরা মন খারাপ করে ঘুরবে।

বোনটা হয়তো দুই ধরনের হবে। পড়াশোনা করতে চাইবে না, শুধু খেলতে। চাইবে। তখন মা বলবেন, তুমি এত দুষ্ট হয়েছ কেন? তোমার যে আপা ছিল নাতাশা, সে তত দুষ্ট ছিল না। সে তো দিন-রাত পড়াশোনা করত। অসম্ভব লক্ষ্মী ছিল সে। আমার বোনটা তখন কত মন খারাপ করবে! হয়তো মনে মনে রাগ করবে আমার উপর। আমি চাই না সে আমার উপর রাগ করুক। আমি চাই না কেউ আমার উপর রাগ করুক। কেউ আমার কথা মনে করে কাঁদুক।

আমি চাই আমার মৃত্যুর পর বাবা-মা একসঙ্গে থাকবে। তারা কোনোদিন কোনো ঝগড়া-টগড়া করবে না। বাবা রাত-বিরেতে নেশা করে বাসায় ফিরবে না। বাবা আবার আগের মতো লাল টুকটুক একটা গাড়ি কিনবে। মাকে পাশে বসিয়ে শাঁ শাঁ করে সেই গাড়ি নিয়ে চলে যাবে চিটাগাং, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার। পেছনের সিটে আমার ছোট দুই ভাইবোন বসবে, তারা খুব হৈচৈ করবে। চিঙ্কার করবে। গান করবে। তারা যতই হৈচৈ করবে বাবা

ততই হাসবেন। মা বিরক্ত হয়ে বলবেন, আহ্‌, চুপ কর তো। তখন বাবা মাকে খ্যাপাবার জন্যে তার বিখ্যাত চাইনিজ গান ধরবেন।

টিং টিং টিটিং টিং
রেবা রেবা লিং লিং

আমার এইসব গোপন ইচ্ছার কথাও আমি আমার ডায়েরিতে লিখি। আগে খুব হেলাফেলা করে ডায়েরি লিখতাম। আসলে জানতাম না তো কী করে ডায়েরি লিখতে হয়। একদিন লিখলাম–

আজ লবণের বাটিতে একটা মরা তেলাপোকা পাওয়া গেল। মা ফুলির মাকে খুব বকা দিলেন। ফুলির মা বলল, আমি কি তেল্যাচুরারে কইছিলাম লবণের বাটিত গিয়া মরতে? আমারে বকেন ক্যান? ফুলির মা'র কথা শুনে মা খুব রেগে গেল। মা বললেন, তোমাকে দিয়ে আমার পুষাবে না। তুমি অন্য কোথাও কাজ দেখ। ফুলির মা বলল, জে আইচ্ছা। যে কাম জানে তার কামের অভাব হয় না। ফুলির মাকে চলে যেতে বললে সে সবসময় বলবে– জে আচ্ছা। কিন্তু কখনো যাবে না।

আরেকদিন লিখলাম–

আজ পটল দিয়ে মাছ রান্না করা হয়েছে। বোয়াল মাছ আর পটল। বাবা বললেন, বোয়াল নিম্নশ্রেণীর মাছ। পটল উচ্চ শ্রেণীর তরকারি। পটল দিয়ে বোয়াল মাছ রান্না ঠিক হয় নি। ভুল হয়েছে। এতে তরকারি হিসেবে পটলকে অপমান করা হয়েছে। এই নিয়ে মা এবং বাবার মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া বেঁধে গেল।

এইসব আজেবাজে কথা লিখে শুধু শুধু পাতা ভরানো। কোনো মানে হয় না। আসলে আমাদের জীবনটা এরকম যে লেখার মতো কিছু ঘটে না। স্কুলে যাওয়া, স্কুল থেকে এসে ভাত খাওয়া, রাতে পড়াশোনা করে ঘুমুতে যাওয়া- ব্যস, এইটুকুতেই সব।

আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি পড়ে মেয়েটার উপর আমার খুব ঈর্ষা হলো। কত ভাগ্যবতী মেয়ে! তার ছোট্ট জীবনে কত কিছু ঘটেছে। আর কী সুন্দর করে গুছিয়েই

সে সবকিছু লিখে গেছে। আমার যদি এরকম ঘটনার জীবন হতো আমিও সুন্দর করে সব লিখে রাখতাম। আনা ফ্রাঙ্কের মতো চিঠির আকারে ডায়েরি। সে তার কল্পনার বান্ধবীকে উদ্দেশ করে চিঠির মতো লিখেছে। আমি লিখতাম বাবাকে উদ্দেশ করে। মাকে উদ্দেশ করেও লেখা যায়। তবে মাকে লিখতে ইচ্ছে করে না। মাকে সবসময় আমার নিজেরই একটা অংশ বলে মনে হয়। তাঁর কাছে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না।

আনার মতো ডায়েরি আমি লেখার চেষ্টা করছি অসুখের পর থেকে। প্রথম দিনই বেশ বড় করে লিখলাম। এখন খুব ছোট ছোট করে লিখছি। কারণ হচ্ছে আমি চোখে ঝাঁপসা দেখছি। মাকে চোখের এই ব্যাপারটা বলা হয় নি। এমনিতেই তিনি চিন্তায় চিন্তায় অস্থির। সেই চিন্তা বাড়িয়ে কী হবে! আমি যদি এখন বলি– মা, আমি চোখে ঝাঁপসা দেখতে শুরু করেছি, তাহলে মা কী করবে? তার কিছুই করার নেই। শুধু শুধু অস্থির হবে আর ভয়ঙ্কর কষ্ট পাবে। এমনিতেই বেচারি কষ্টে মরে যাচ্ছে। সেই কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কী?

বাবাকে উদ্দেশ করে লেখা প্রথম ডায়েরির লেখাটা এরকম (খুব চেষ্টা করেছি আনা ফ্রাঙ্কের মতো হাসি-খুশিভাবে লিখতে। হয় নি।)

বাবা,

আজ আমার একটা অসুখ ধরা পড়েছে। অসুখটার নাম মেনিনজিওমা। এরকম অদ্ভুত নাম তুমি নিশ্চয়ই এর আগে শুন নি। কেউই বোধহয় শুনে নি। যাকেই এই নাম বলা হবে সে-ই ভুরু কুঁচকে বলবে, অসুখটা কী?

অসুখটা ভয়াবহ। কতটা যে ভয়াবহ তা আমি মাকে দেখে বুঝতে পারি। আমার অসুখ ধরা পড়ার পর থেকে মাকে দেখাচ্ছে অবিকল মরা মানুষের মতো। তোমার মনে আছে, দাদিজানের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাকে আমরা দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি পুরনো কালো খাটটায় তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার মুখ হলুদ রঙের একটা চাঁদরে ঢাকা। সাধারণত মৃতদেহ সাদা চাঁদরে ঢাকা থাকে। দাদিজানকে হলুদ চাঁদরে কেন ঢাকল কে জানে! বোধহয় ঘরে কোনো সাদা চাঁদর ছিল না। আমরা দাদিজানের খাটের পাশে দাঁড়ালাম। কে একজন তার মুখ থেকে চাঁদর সরিয়ে দিল। আমি আঁৎকে উঠলাম। প্রাণহীন মানুষের মুখ এত ভয়ঙ্কর!

মায়ের মুখও প্রাণহীন মানুষদের মুখের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। তিনি অবশ্যি খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন, যেন আমি কিছু বুঝতে না পারি। যেদিন আমার অসুখটা মা প্রথম জানলেন সেদিন বাসায় ফিরেই ফুলির মাকে বললেন, বুয়া, চা কর। নাতাশাকেও এক কাপ দিও।

ফুলির মা হতভম্ব গলায় বলল, আফনের হইছে কী?

কিছু হয় নি। হবে আবার কী? টায়ার্ড।

সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, অনেকদিন টিভি দেখা হয় না। আজ টিভি দেখব। ইন্টারেস্টিং কিছু কি আজ টিভিতে আছে?

সে-রাতে অতি কুৎসিত একটা নাটক হলো। একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে। তাকে না পেলে সে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে সে বিয়ে করবে না, কারণ বিয়ে করলে তার ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাবে। কী যে জগাখিচুড়ি! বড় বড় সব কথা। একটু পর পর কবিতা আবৃত্তি। নায়ক এক একবার কাঁপা কাঁপা গলায় কবিতা শুরু করে আর আমার ইচ্ছা করে দেই কষে একটা চড়।

মা সেই নাটকও চোখ বড় বড় করে দেখল এবং নাটক শেষ হলে বলল, মন্দ না তো। রাতে মা আমার সঙ্গে ঘুমুতে এলো। সে-রাতে খুব গরম পড়েছিল। তার উপর ছিল না ইলেকট্রিসিটি। কিছুতেই আমার ঘুম আসছে না। মা বোধহয় মানসিকভাবে খুব ক্লান্ত ছিল। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। আমি জেগে আছি। এপাশ-ওপাশ করছি। তখন হঠাৎ মনে হলো– মানুষের যেমন ‘অসুখ’ হয় সেরকম ‘সুখ’ হবার নিয়ম থাকলে খুব ভালো হতো। পৃথিবীতে নানান ধরনের অসুখের মতো নানান ধরনের সুখ থাকত। ছোট সুখ, বড় সুখ। একেক সুখের একেক নাম। কোনো মা’র মেয়ের বড় ধরনের সুখ হলে সেই মা আনন্দে অস্থির হয়ে চারদিকে টেলিফোন করে খবর দিত– আমার মেয়ের না এই সুখ হয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। কী যে আনন্দ হচ্ছে ভাই!

আনন্দ হবারই কথা। আমি সবসময় দেখেছি আপনি ভাগ্যবতী।

মেয়েটার জন্যে দোয়া করবেন আপা।

ডায়েরি এইখানেই শেষ।

আচ্ছা, আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? কী দিয়ে শুরু করেছিলাম আর কী বলছি। শুরু করেছিলাম কী দিয়ে? ঐ যে দুপুরে ঘুম ভাঙার পর মনে হলো আজ খুব আনন্দের কিছু ঘটবে। সারাদিন কিছু ঘটল না।

খুব আশা ছিল বাবার কাছ থেকে একটা চিঠি নিশ্চয়ই আসবে। অনেকদিন বাবা চিঠি লিখেন না। কে জানে হয়তো তাঁর অসুখ-বিসুখ হয়েছে। অসুখ হলে সেখানে তাঁকে দেখার কেউ নেই। তিনি থাকেন একা, নিজেই বেঁধে খান। শেষ চিঠিতে বাবা তার রান্না করার কথা লিখেছেন। কী সুন্দর করেই না লিখলেন–

ও আমার টিয়া পাখি,

আজ দুপুরে রান্না করার সময় তোর কথা মনে পড়ল। কেন বল তো? কারণ আজ একটা দারুণ জিনিস রান্না করেছি। পাহাড়ি একটা মাছ– ওরা বলে দুই মাছ কিংবা চই মাছ। দেখতে এত সুন্দর যেন রূপার একটা পাত। অনেকটা চাঁদা মাছের মতো– চ্যাপ্টা। মুখটা লাল টুকটুক। প্রথমে ভাবলাম ভেজে ফেলি। দেখি, ঘরে মাছ ভাজার মতো তেল নেই। কাজেই তরকারি করা হলো। তরকারি চড়িয়ে দিয়ে মনে হলো– টিয়া পাখি থাকলে এই

মাছ আমাকে রান্না করতে দিত না। সে বলত, এত সুন্দর মাছ তুমি কেটেকুটে খেয়ে ফেলবে। পানিতে ছেড়ে দিয়ে আস বাবা।

যাই হোক, মাছটা দেখতে যত সুন্দর খেতে ততই অসুন্দর। বিশ্রি গন্ধ। পচা নাড়িভুড়ি থেকে যে-রকম গন্ধ আসে সেরকম গন্ধ। প্রচণ্ড সর্দিতে নাক বন্ধ থাকলেই শুধু এই মাছ খাওয়া চলে নয়তো না।

আমি অল্প একটু খেয়ে বমি করে সব ফেলে দিয়েছি। সারাদিনই শরীরটা কেমন কেমন করেছে। মনে হয় 'ছই' কোনো বিষাক্ত মাছ। এই কারণে বোধহয় বাজারে বিক্রি হয় না। আমি নিজে জাল ফেলে ধরেছি। ভালো কথা– আমার একটা জাল আছে। সেই জাল ফেলে আমি নিজেই শঙ্খ নদীতে মাছ ধরি। একবার একটা সাপ ধরেছিলাম। বিশাল সাপ। মুরং এক ছেলে খুব আগ্রহ করে সাপটা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। মুরংরা সাপ খায়। মুরং ছেলেটার নাম 'উলাপ্রু'। সে মাঝে মাঝে এসে আমার কাজকর্ম করে দেয়। একবার তাকে কিছু কাপড় ধুতে দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের

লুঙ্গি খুলে নেংটো হয়ে কাপড় ধুতে শুরু করল। নিজের লুঙ্গিটা খুলে নিল কারণ কাপড় ধোয়ার সময় লুঙ্গি ভিজে যাবে। এদের লজ্জা-শরম একটু কম। আজ এই পর্যন্তই মা।

পরে তোকে লম্বা চিঠি দেব।

ইতি–

তোর বাবা

পুনশ্চ : উলা বলেছে সাপটা নাকি খেতে দারুণ ছিল। পেট ভর্তি ছিল ডিম।

অফিস থেকে ফিরলেন অনেক দেরি করে। ফিরেই আবার বের হয়ে পড়লেন। আমার ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বুয়া রান্নাঘরে রান্না করছে। আমি একটা বই হাতে শুয়ে আছি। ঘরে আলো আছে কিন্তু পড়তে পারছি না। লেখাগুলি সব ঝাঁপসা। কেউ যদি পড়ে পড়ে শোনাত ভালো লাগত।

দরজার কলিংবেল বাজছে।

কে এসেছে?

বাবা?

মনে মনে যা আশা করা হয় তা ঘটে না। উল্টোটা হয়। কাজেই আমি ভাবতে লাগলাম- বাবা আসেন নি। বড় খালু এসেছেন। বড় খালুকে আমার অসহ্য লাগে। কাজেই বড় খালুর কথা ভাবলে হয়তো দেখা যাবে বাবা এসেছেন। ফুলির মা দরজা খুলেছে। তার কোনো কথা শুনা যাচ্ছে না। তাহলে বাবা আসেন নি। বাবা এলে ফুলির মা ‘চাচাজান’ বলে বিকট একটা চিৎকার দিত।

আমার টিয়া পাখি কই রে?

আমি কি ভুল শুনছি? কে টিয়া পাখির খোঁজ করছে? আরে এই তো। এই তো বাবা।

বাবা ঘরের মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে।

আকাশ-পাতাল বিস্ময় নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, মা, তোর কী হয়েছে?

আমি হাসার চেষ্টা করলাম। হাসতে পারলাম না।

বাবা আমাকে দেখে কষ্ট পাচ্ছেন। খুব কষ্ট পাচ্ছেন। বাবাকে আমি খুব কষ্ট দিলাম এই দুঃখে আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়তে লাগল।

৫. সাজ্জাদ বারান্দায় বসে আছে

সাজ্জাদ বারান্দায় বসে আছে। বারান্দা অন্ধকার। দিলশাদ এখনো ফেরে নি। ফুলির মা চা রেখে গেছে। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। সাজ্জাদ চায়ের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করছে না। অল্প সময়ের মধ্যে সে বেশ কয়েকটা সিগারেট খেয়ে ফেলল। সিগারেটের ধোঁয়ায় এখন তার মাথা ঘুরছে। এতদিন পর এসেছে। তার উচিত মেয়ের পাশে বসে থাকা। তার সেই ইচ্ছাও করছে না। দিলশাদের সঙ্গে আগে একটা বোঝাঁপড়া হওয়া দরকার। এমন ভয়াবহ অসুস্থ একটা মেয়ে। চিকিৎসার জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছে। আর সে খবরটাও জানবে না? এ কেমন কথা?

ফুলির মা বলল, চাচাজান, সিনান করবেন না?

সাজ্জাদ বিরক্ত গলায় বলল, না। দিলশাদ আসবে কখন?

জানি না। বলছেন ডাক্তারের ধারে যাবেন। আপনের শইল কি ভালো চাচাজান?

আমার শরীর নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

বরফ দিয়া ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিমু? আম্মা ফিরিজ কিনছে। নয়া ফিরিজ– লাল কালার। পুরানটা বেইচ্যা দিছে।

আচ্ছা ঠিক আছে। দাও, পানি দাও।

দাম মিলে নাই। তেরশ টাকা মিলছে।

তুমি যাও। আমাকে ঠাণ্ডা পানি এনে দাও।

নয়া ফিরিজটার দাম পড়ছে চাইর হাজার সাতশ। ঠেলাওয়ালা নিছে সত্তর টেকা।

তুমি সামনে থেকে যাও তো ফুলির মা। এত বকবক করছ কেন? এমন বকবকানি স্বভাব তত তোমার আগে ছিল না।

ফুলির মা চলে গেল। তার আরো অনেক গল্প করার ইচ্ছা ছিল, সাহসে কুলাল। চাচাজানের মেজাজ ভালো নেই। ঘরের ভেতর থেকে নাতাশা ডাকল, বাবা, শুনে যাও তো।

সাজ্জাদ মেয়ের ঘরে ঢুকল। মেয়ের দিকে তাকাল না। তাকাতে ইচ্ছা করছে না। নাতাশা বলল, তুমি এত রেগে আছ কেন বাবা?

রাগি নাই।

ধমকাধমকি করছ।

আরে বক বক করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

এতদিন পরে এসেছ, বেচারার তোমার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে।

সাজ্জাদ তিক্ত গলায় বলল, তোর এত বড় অসুখ আমি জানলাম না কেন? আমার জানতে অসুবিধাটা কোথায় ছিল?

এই নিয়ে তুমি মার সঙ্গে ঝগড়া করবে?

ঝগড়া করব না। আমি শুধু জানতে চাইব। জানার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

তুমি তো দেখি আমার সঙ্গেই ঝগড়া শুরু করে দিলে। বাবা, আমার কথা শোন বাথরুমে গিয়ে ভালো করে গোসল কর। তারপর গরম এক কাপ চা খাও। এরমধ্যে মা এসে পড়বে। ঝগড়া যে এক্ষুনি করতে হবে তা তো না। কয়েকদিন পরেও করতে পারবে। মা খুব কষ্টের মধ্যে আছে বাবা। সারাদিন ছোটাছুটি করে। টাকার জোগাড় হচ্ছে না। এদিকে যাবার সব ঠিকঠাক। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে মা আসবে, আর আসামাত্র তুমি একটা ঝগড়া শুরু করবে, সেটা কি ভালো হবে?

আমার ভালো-মন্দ তোকে দেখতে হবে না।

যে কদিন আমি বেঁচে থাকব সেই কদিন আমিই দেখব। তুমি না চাইলেও দেখব। বাবা, গোসল করতে যাও। আমি বুয়াকে বলছি চা বানানোর জন্যে। তুমি বাথরুম থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে চা দেবে। গোসলের পর চায়ে চুমুক দেবার পর দেখবে তোমার রাগ অনেকটা কমে গেছে।

সাজ্জাদ বাথরুমে ঢুকল। গোসল সেরে চা খেয়ে মেয়ের পাশে বসল। নাতাশা খুব আগ্রহ নিয়ে গল্প করে যাচ্ছে। সাজ্জাদ শুনছে। আবার ঠিক শুনছেও না। সে আছে একধরনের

ঘোরের মধ্যে, যে ঘোর কখনো কাটবে না। রাত দশটার উপর বাজে। দিলশাদ এখনো ফিরছে না। সাজ্জাদ বলল, তোর মা কি রোজই এমন দেরি করে?

এখন প্রায়ই করে। তোমার খিদে লেগেছে, তুমি কি খেয়ে নেবে?

তুই কখন খাবি?

একটু পরেই খাব। বাবা, তোমার রাগটা কি কিছু কমেছে?

সামান্য কমেছে।

আরো একটু কমাও।

আচ্ছা যা, কমাব। তোর মা'র এত দেরি করে ফেরার কারণ তো বুঝতে পারছি না। ঢাকার রাস্তাঘাটও তো সুবিধার না।

তুমি চিন্তা করো না বাবা, মা এসে পড়বে। তুমি বরং ভাত খেয়ে নাও। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব খিদে পেয়েছে।

রাত দশটার পর তো কোথাও কোনো ডাক্তার থাকার কথাও না।

আজ মা'র মেজোখালার বাসায় যাবার কথা। ডাক্তারের কাছ থেকে হয়তো সেখানে গেছেন। মেজোখালু সাহেবের আজ মাকে কিছু টাকা দেয়ার কথা।

নাতাশা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মা টাকা চেয়ে চেয়ে ঘুরছে। কী খারাপ যে তাঁর লাগছে কে জানে!

.

দিলশাদ তার মেজোবোন দিলরুবার বাসায় রাত আটটা থেকে বসে আছে। স্বামী স্ত্রীর দুজনের কেউই ফ্ল্যাটে নেই। উত্তরায় তাদের বাড়ি হচ্ছে, সেই বাড়ি দেখতে গেছে। কাজের মেয়ে বলল, আইস্যা পড়ব। এক্ষণ আসব।

কাজের দুটি মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। দিলরুবার একটিই মেয়ে, সে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করে। ছুটি-ছাটায় আসে। এখন গরমের ছুটি চলছে সে আসে নি। শান্তিনিকেতন থেকে একটা দল যাচ্ছে মালয়েশিয়ায়। সে তাদের সঙ্গে যাবে।

দিলরুবাদের ফ্ল্যাট ছবির মতো সুন্দর। হালকা গোলাপির কম্বিনেশন। কার্পেট গোলাপি, সোফার কাপড় গোলাপি, জানালার পর্দাও গোলাপি। দেয়ালে কিছু পেইন্টিং আছে। মনে হয় অর্ডার দিয়ে আঁকানো, কারণ পেইন্টিং-এও গোলাপি রঙের আধিক্য। গোলাপি রঙটা দিলশাদের অপছন্দ, কিন্তু এই ঘরে রঙটা এত মানিয়েছে। সবচে সুন্দর লাগছে গাঢ় গোলাপি ভেলভেটের সোফাসেট। সমস্যা একটাই- গা এলিয়ে আরাম করে বসতে অস্বস্তি লাগে। মনে হয় ভেলভেট ব্যথা পাবে। দিলশাদ অবশ্যি গা ছেড়েই শুয়ে আছে। এত ক্লান্ত লাগছে, মনে হয় সে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়বে। কাজের মেয়েটি বলল, চা দিব আফা?

দিলশাদ বলল, চা না, যদি পার লেবুর সরবত বানিয়ে দাও। ঘরে লেবু আছে?

আছে। আফা সেন্ডেল খুইল্যা বসেন। নতুন কার্পেট কিনছে। কেউ স্যান্ডেল লইয়া উঠলে আম্মা মনে মনে বেজার হয়।

দিলশাদ স্যান্ডেল খুলতে খুলতে বলল, এত সুন্দর জিনিস নষ্ট হলে মন খারাপ তো হবেই।

একটুকরা মোড়া কাপড়। দাম হইল ত্রিশ হাজার টেকা। শুনলেই বুক কাঁপে।

তাহলে তো শুধু স্যান্ডেল খুলে সোফায় উঠলে হবে না, অজু করে উঠতে হবে।

কাজের মেয়েটা সরু চোখে দিলশাদকে দেখছে। এই মেয়েটি কি সাজ্জাদের ঘড়ি চুরির খবর দিয়েছিল? যদি সে হয় তাহলে দিলশাদের দিকেও সে লক্ষ রাখবে। চলে যাবার সময় দিলশাদ কি বলবে– বুয়া, দেখে নাও তোমাদের জিনিস সব ঠিকঠাক আছে কি-না।

.

দিলরুবা বাড়িতে ঢুকল রাত দশটায়। ছোটবোনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, ওমা, তুই! কখন এসেছিস?

নটা থেকে বসে আছি। তুমি একা যে, দুলাভাই কোথায়?

আজ ছাদ ঢালাই হচ্ছে। ও থাকবে। রাত একটা-দেড়টার আগে ফিরবে না। আমাকেও থাকতে বলেছিল। ভাগ্যিস থাকি নি। থেকে গেলে তোর সঙ্গে দেখা হতো না। তুই আসবি জানলে ওকেও নিয়ে আসতাম।

আজ যে আসব সেটা তো দুলাভাইকে টেলিফোন করে বলেছিলাম।

ওর আজকাল কিছু মনে থাকে নাকি? ও যে নিজের নাম মনে রাখে সে-ই যথেষ্ট।

কেন?

বুঝলি দিলু, ব্রেইন ডিফেক্টের মতো হয়ে গেছে। ব্যবসার অবস্থা ভয়াবহ। বড় অ্যামাউন্টের একটা এলসি খুলেছিল। ব্যাংক থেকে কী যেন প্রবলেম করছে। আমি জানিও না, কিছু বুঝিও না। গতকাল আমাকে বলে, রুবা, আমাকে একলাখ টাকা ধার দাও না। তিনশ বস্তা সিমেন্ট কিনব। অবস্থা চিন্তা কর। আমি টাকা পাব কোথায়? শেষে বলে, তোমার গয়না বিক্রি কর। ভাবটা এরকম যেন আমার লাখ লাখ টাকার গয়না আছে। ওর বন্ধুবান্ধব এখন ওকে দেখলে পালিয়ে বেড়ায়। সবাই ভাবে, বোধহয় এক্ষুনি টাকা ধার চাইবে...।

দিলশাদ তাকিয়ে আছে। সে ক্লান্ত গলায় বলল, তোমার এই অবস্থা!

হ্যাঁ রে দিলু, এই অবস্থা। বাইরে থেকে দেখে কেউ কিছু বুঝবে না। ঠাটবাট সবই আছে। তিনদিন আগে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে কার্পেট কিনলাম। এখনো টাকা দেয়া হয় নি। রোজ টেলিফোন করছে। একবার ভাবলাম বলি, আপনারা আপনাদের কার্পেট নিয়ে যান। শেষে ভাবলাম, ঠিক আছে, যাক কয়েকটা দিন। দরকার হলে গয়না বেচব। কী করা! গয়না তো আজকাল কেউ পরে না। লকারেই পড়ে থাকে। বিক্রি করলেই কী, আর না করলেই কী। তুই কি কিছু খেয়েছিস দিলু? না শুধু-মুখে বসে আছিস?

লেবুর সরবত খেয়েছি।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ভাত খাবি? ভাত খা। ওর এক বন্ধু রূপচান্দা শুঁটকি পাঠিয়েছে চিটাগাং থেকে। ঝাল ঝাল করে বেঁধেছি। খেয়ে যা।

না, কিছু খাব না। আজ উঠব।

তুই কি টাকার জন্যে এসেছিলি?

হ্যাঁ। দুলাভাই আজ আসতে বলেছিলেন।

কাল আয়। কাল এসে ওর সঙ্গে কথা বল। আমি ওকে বাসায় থাকতে বলে দেব। তাবে তোকে সত্যি কথা বলি–ওর পক্ষে সম্ভব না। ওর ভয়াবহ অবস্থা। তোর টাকা জোগাড় হয়েছে কেমন?

সামান্যই হয়েছে।

বড় দুলাভাই যে টাকাটা দেবেন বলেছেন, দিয়েছেন?

এখনো দেন নি।

টাকাটা নিয়ে নে। আপার সঙ্গে দুলাভাইয়ের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। বড় . দুলাভাই আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছেন। এখন শুনছি বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকেন। হোটেল থেকে ভাত আনিয়ে খান। সম্পর্ক আরো খারাপ হবার আগেই টাকাটা নিয়ে নেয়া দরকার।

আপা, আমি আজ উঠি।

তুই বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করিস নি। তুই ভেবেছিস আমি বানিয়ে বানিয়ে অভাব-টভাবের কথা বললাম।

তা ভাবব কেন!

বিশ্বাস কর, আমি এক বর্ণ মিথ্যা বলি নি। পাপিয়া একটা মিউজিক্যাল ট্যুরে মালয়েশিয়া যাবে। ওর বাবাকে লিখল পাঁচশ ডলার পাঠাতে। ঘুরবে-টুরবে, কেনাকাটা করবে। ওর বাবা বলল, মালয়েশিয়ার কোনো দরকার নেই। মেয়েকে ঢাকায় চলে আসতে বলল। ওর পড়ার খরচ দিতে পারব কিনা তার নেই ঠিক। শেষপর্যন্ত অবশ্যি টাকা পাঠিয়েছে। কী করে পাঠিয়েছে সে-ই জানে। আমি ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি নি।

আপা, আজ উঠি?

উঠবি? দাঁড়া, তোকে কয়েকটা রূপচান্দা মাছের শুঁটকি দিয়ে দি।

শুঁটকি দিতে হবে না। তুমি তোমার ড্রাইভারকে বলো আমাকে একটু নামিয়ে দিতে। এত রাতে একা যেতে ভরসা হচ্ছে না।

ভরসা হলেও তোকে আমি একা ছাড়ব নাকি? দিলু, বড় দুলাভাইয়ের ব্যাপারে যেটা বললাম মনে রাখিস। ভুজুং-ভাজুং দিয়ে টাকাটা ম্যানেজ করে নে। কালই যাবি।

দেখি।

এখানে দেখাদেখির কিছুই নেই। প্রয়োজনটা আমাদের। ও, আসল কথা বলতে ভুলে গেছি। পাপিয়ার বাবার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে, টিভির কর্তা ব্যক্তি। তার সঙ্গে পাপিয়ার বাবার কথা হয়েছে। ওদের একটা ম্যাগাজিন। নাতাশাকে প্রজেক্ট করবে। নাতাশার সঙ্গে কথা-টথা বলবে। প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল এটা বলে তার জন্যে সাহায্য চাওয়া হবে। লোকজন এমনিতে কিছু দিতে চায় না। কিন্তু টিভিতে কিছু প্রচার করলে হু হু করে টাকা আসতে থাকে। আমাদের কিছু করতে হবে না। শুধু ব্যাংকের একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেয়া থাকবে। টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে। নাতাশাকে টিভি স্টেশনে যেতেও হবে না। টিভি ক্রুরা বাসায় এসে রেকর্ড করবে।

দিলশাদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, এসবের কোনো দরকার নেই আপা।

দরকার নেই কেন? আমি তো কোনো অসুবিধা দেখছি না। আমাদের কার্যোদ্ধার দিয়ে হচ্ছে কথা।

নাতাশা মনে কষ্ট পাবে। এমনিতেই সে ভয়াবহ কষ্টের মধ্যে আছে। আমি সেই কষ্ট আর বাড়াতে চাই না।

ফট করে না বলিস না। ভেবে দেখ।

এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই। আপা, আমি আজ যাচ্ছি।

আয়, আমিও তোর সঙ্গে যাই। তোর বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে আসি।

তোমাকে যেতে হবে না। তুমি উত্তরা থেকে ক্লান্ত হয়ে এসেছ। তুমি বিশ্রাম কর।

দিলরুবা দুটা রূপচান্দার শুঁটকি পলিথিনের ব্যাগে করে নিয়ে এলো। সঙ্গে একটা গল্পের বই। শরদিন্দুর 'ঝিন্দের বন্দি'।

নাতাশার জন্যে পাপিয়া পাঠিয়েছে। বইটা ওকে দিয়ে দিস। কাল-পরশু একবার গিয়ে ওকে দেখে আসব।

দিলশাদ ক্লান্ত গলায় বলল, আচ্ছা এসো।

তোকে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলা হয় নি। আমাদের সামনের বাসায় যে ভাড়াটে থাকে– আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় অফিসার। সে সেদিন হঠাৎ এসে আমাকে একটা দাওয়াতের কার্ড দিয়ে গেল। ওদের কী যেন অফিসিয়েল ফাংশান, যেতেই হবে...।

আপা, তোমার এই গল্প আরেকদিন এসে শুনব। আজ যাই।

.

সাজ্জাদ মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। গল্প করে আগের মতো আনন্দ পাচ্ছে না। নাতাশা তার দিকে তাকিয়ে আছে ঘুম ঘুম চোখে।

সাজ্জাদ একবার বলল, মা, ঘুম পাচ্ছে?

নাতাশা বলল, ঘুম পাচ্ছে না তো। অসুখের জন্যে আমার চোখ ছোট ছোট হয়ে গেছে। তুমি সাইনবোর্ডের গল্পটা আরেকবার বলল।

শোনা গল্প আবার শুনবি?

হুঁ।

নতুন অনেক গল্প আছে। সেগুলি শোন। জঙ্গলের গল্প।

না। তুমি গল্প বলার সময় আমার দিকে তাকিও না। আমার দিকে তাকালে তোমার মনে হবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তুমি আগের মতো মজা করে গল্প করতে পারবে না। বাবা, শুরু কর।

সাজ্জাদ চিন্তিত গলায় বলল, তোর মা এখনো আসছে না। এগারটার উপরে বাজে।

তোমার গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মা চলে আসবে। দেরি না করে তুমি শুরু কর তো বাবা।

তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছি। রেজাল্ট বেরুতে দু-তিন মাস দেরি। আমাদের কিছু করার নেই। সময় আর কাটছে না। কয়েক বন্ধু মিলে প্ল্যান করলাম, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ট্যুর দেব। সাইকেল ট্যুর। আমরা ছয় বন্ধু, সাইকেল জোগাড় হলো তিনটা। ট্যুর প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেল। কী করা যায় কিছুই বুঝতে পারছি না। একেকদিন একেকজনের মাথা থেকে একেক ধরনের আইডিয়া আসে। আইডিয়া নিয়া চিন্তা-ভাবনা

করতে করতে সময় কেটে যায়। কাজের কাজ কিছুই হয় মা। আমাদের এক বন্ধু ছিল– করিম। এফ, করিম।

বাবা, উনি এখন কোথায়?

জার্মানি চলে গিয়েছিল। সেখানেই নিখোঁজ হয়ে গেছে। কেউ কোনো খবর জানে না।

তোমার সেই বন্ধুর যা বুদ্ধি, আমার ধারণা, উনি বড় কিছু করেছেন।

করতে পারে। তবে ওর বুদ্ধির সবটাই ফাজলামি ধরনের। ফাজলামি ধরনের বুদ্ধি দিয়ে খুব বেশি কিছু করা যায় না মা।

তারপর কী হলো বাবা বললো।

এক রাতে করিম বলল, চল আমরা এক কাজ করি। শহরের মানুষগুলির পিলে চমকানোর ব্যবস্থা করি। আক্কেল গুড়ুম করে দি। আমি বললাম, কীভাবে করবি? করিম বলল, এমন কিছু করব যে শহরের লোকগুলির চোখ শুধু কপালে না, মাথার তালুতে উঠে যাবে। যেমন ধর, এক দোকানের সাইনবোর্ড অন্য দোকানে লাগিয়ে দেব। এক রাতের মধ্যে সব সাইনবোর্ড বদলে দেব। মিষ্টির দোকানে ঝুলবে ফার্মেসির সাইনবোর্ড। কাঠের দোকানে ইউনানি দাওয়াখানার সাইনবোর্ড। করিমের আইডিয়া আমাদের সবার যে পছন্দ হলো তা না। কিছুই করার নেই। বলেই আমরা রাজি হলাম। মফস্বল শহরে পাহারাদার-টার এমন থাকে না। রাতটাও ছিল শীতের রাত। সবাই গভীর ঘুমে। আমরা হাতুড়ি, পেরেক আর খুন্তি নিয়ে বের হলাম। তারপর শুরু করলাম সাইনবোর্ড বদলানো। কিছুক্ষণের মধ্যেই

খুব মজা পেয়ে গেলাম। রাত সাড়ে তিনটার মধ্যে সব সাইনবোর্ড পাল্টানো হয়ে গেল। আমরা খুশি মনে ঘুমুতে গেলাম। পরদিন সারা শহরে হৈচৈ পড়ে গেল। সবার মুখে মুখে সাইনবোর্ডের কথা। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে কত রকম গবেষণা, কত থিওরি। মফস্বল শহরে তো আর উত্তেজনার মতো কিছু ঘটে না। সামান্য কিছু ঘটলেই তা নিয়ে তোলপাড় হয়ে যায়। আমরা কল্পনাও করি নি আমাদের সাইনবোর্ড পাল্টানোর ব্যাপারটা এত আলোড়ন তুলবে। আমরা চিন্তা করতে লাগলাম এর পর কী করা যায়। টিয়া পাখি, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

নাতাশা জবাব দিল না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সাজ্জাদ ভেতরের বারান্দায় চলে গেল। অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয় না। গল্প বলে বলে মুখ শুকিয়ে গেছে। সাজ্জাদ বেতের চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেল বাজল। তার নিজেরই দরজা খুলে দিতে ইচ্ছা করছে। সেটা সম্ভব হলো না। ফুলির মা ছুটে গেল। হড়বড় করে সে চাচাজানের আসার সংবাদ দিচ্ছে। দিলশাদকে না দেখেই সাজ্জাদ বুঝতে পারছে ফুলির মা'র উৎসাহ দিলশাদের ভেতর সংক্রমিত হলো না। সে শুধু জিজ্ঞেস করল– নাতাশা খেয়েছে? সাজ্জাদের মনে হলো, মানুষকে অগ্রাহ্য করার অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে এই মহিলা জন্মেছে। তবু নিজের স্বামীকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা সম্ভব না। সে অবশ্যই বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করবে, কখন এসেছ? সাজ্জাদ অপেক্ষা করতে লাগল। দিলশাদ বারান্দায় এলো না। সে কাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। তার শরীর ঘামে কুটকুট করছে। সে আজ অনেক সময় নিয়ে গোসল করবে এবং বাথরুমের নির্জনতায় কিছুক্ষণ কাঁদবে। আজ তার কেন জানি কান্না পাচ্ছে।

তাদের দেখা এবং কথা হলো খাবার টেবিলে। সাজ্জাদ লক্ষ করল দিলশাদকে খুব রোগা এবং অসুস্থ লাগছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। মেয়ের অসুখ নিয়ে সে অকুল সমুদ্রে পড়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে। সাজ্জাদের খুব মায়া লাগল। কিছু অত্যন্ত কঠিন কথা বলবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। এখন মনে হচ্ছে কোনো কিছুই বলা ঠিক হবে না।

দিলশাদ শুকনো গলায় বলল, তুমি খেয়ে নাও। আমি এখন খাব না।

রাত তো কম হয় নি। এখন খাবে না তো কখন খাবে?

যখন খেতে ইচ্ছা করবে তখন খাব। আমার ব্যাপার নিয়ে তোমাকে অস্থির হতে হবে না।

অস্থির হচ্ছি না, শুধু জিজ্ঞেস করলাম।

জিজ্ঞেস করারও দরকার নেই। তোমাকে খেতে দেওয়া হয়েছে, তুমি খেয়ে নেবে।

সাজ্জাদ প্লেটে ভাত নিল। দিলশাদ এমন কঠিন আচরণ কেন করছে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। বড় বিপর্যয়ের সময় মানুষ কাছাকাছি চলে আসে, সে দূরে চলে যাচ্ছে কেন?

ফুলির মা চিন্তিত মুখে পানির জগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দিলশাদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, জগ হাতে সঙ-এর মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? এত বড় টেবিলে জগ রাখার জায়গা পাচ্ছ না? জগ নামিয়ে রেখে বসার ঘরে তোমার চাচাজানের বিছানা করে দাও। আমার খাটের নিচে তোষক আছে, মশারি আছে। যাও সামনে থেকে। হা করে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

সাজ্জাদ ডাল নিতে নিতে বলল, পৃথক বিছানা হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে। কোনো অসুবিধা আছে?

না। অসুবিধা নেই। টিয়া পাখি ঘুমুচ্ছে, হৈচৈ করো না।

তুমি আমার এখানে থাকলে হৈচৈ হবে। চেঁচামেচি হবে। হৈচৈ ছাড়া বাস করতে চাইলে যেখান থেকে এসেছ সেখানে চলে যাও। জঙ্গলে চলে যাও।

সাজ্জাদ হতাশ গলায় বলল, তুমি অকারণে রাগ করছ, রাগ করার মতো কোনো অপরাধ আমি এখনো করি নি। বরং তুমি অপরাধ করেছ। নাতাশার অসুখের খবর আমাকে জানাও নি। আমাকে না জানানোর পেছনে তোমার লজিক কী তা আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোনো লজিক আছে। তুমি লজিক ছাড়া কোনো কাজ করবে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে আমি সম্ভবত আমার অল্প বুদ্ধির কারণে তোমার লজিক ধরতে পারছি না। এখনি বা কেন হঠাৎ করে রেগে যাচ্ছ সেটাও বুঝতে পারছি না।

দিলশাদ প্রায় অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, নাতাশার অসুখের খবর জানলে তুমি কী করতে? তোমার কি কিছু করার ক্ষমতা আছে? মেয়ের চিকিৎসার জন্যে এগার লাখ টাকা আমার দরকার। তুমি পারবে এগার লাখ টাকা জোগাড় করতে? কী হবে তোমাকে জানিয়ে? আমাকে ধন্যবাদ দাও যে তোমাকে জানাই নি। জানাই নি বলে নিশ্চিন্ত মনে এই কমাস মদ-ফদ খেয়ে ফুর্তি করতে পেরেছ। জানালে এই ফুর্তিও করতে পারতে না।Thave spared you the pain.

সাজ্জাদ টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, তুমি ইচ্ছা করলে খেতে বসতে পার।

দিলশাদ ফুলির মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, টেবিল পরিষ্কার কর, আমি খাব না।

সাজ্জাদ বলল, আমার উপর রাগ করে খাওয়া বন্ধ করার কোনো মানে হয় না। তুমি বাচ্চা মেয়ে না। তুমি ভয়াবহ টেনশানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ তা বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি বলেই রাগ করছি না।

তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না, প্লিজ। লোমার সঙ্গে আমার কথা বলতেও ইচ্ছা করে না। তুমি ছিলে না, আমি শান্তিতে ছিলাম।

এখন আমি কি খুব অশান্তি করছি?

হ্যাঁ করছ। অশান্তি যে করছ তুমি নিজেও সেটা ভালো করে জানো। আজ এই যে আমার এত সমস্যা তার মূলেও কিন্তু তুমি।

সাজ্জাদ বিস্মিত হয়ে বলল, আমি!

দিলশাদ সহজ স্বাভাবিক গলায় প্রায় কাটা কাটা ভঙ্গিতে বলল, হ্যাঁ তুমি। দুষ্টগ্রহের কথা বইপত্রে লেখা থাকে না? তুমি আমার জীবনের দুষ্টগ্রহ।

সাজ্জাদ তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল, নাতাশা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে সেটাও আমার জন্যে?

অবশ্যই তোমার জন্যে। ওর অসুখ জেনেটিক অসুখ। তোমার জিন আমার জিন মিশ খায় নি বলেই নাতাশার জিনে এই গণ্ডগোল হয়েছে। আমার মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। সিগারেট ধরাবে না। খবরদার! কিছুক্ষণ আগে এসেছ, এর মধ্যেই বাসা ধোয়ায় ঢেকে ফেলেছ। নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই।

সাজ্জাদ সিগারেট ধরাল না। হাতের সিগারেট প্যাকেটে রেখে দিল। এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে হকচকিয়ে গিয়েছে। দিলশাদ এই পর্যায়ে যাবে সে ঠিক ভাবতে পারে নি।

ফুলির মা ঘরে নেই। তবে সে চলেও যায় নি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। সাজ্জাদ দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, ফুলির মা, আমি এক কাপ চা খাব।

দিলশাদ সাজ্জাদকে অবাক করে দিয়ে বলল, চা আমি বানিয়ে এনে দিচ্ছি। But do me a favour, চা খেয়ে অন্যকোথাও চলে যাও।

অন্যকোথাও চলে যাব?

দিলশাদ শান্ত গলায় বলল, নিজের উপর আমার এখন আর আগের মতো কন্ট্রোল নেই। রাগ সামলাতে পারি না। তুমি বাসায় থাকলে আমার রাতে ঘুম হবে। আমি ক্রমাগত তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব। নাতাশা শুনবে। সে কিছু বলবে কিন্তু কষ্ট পাবে। সে এমনিতেই অনেক কষ্ট পাচ্ছে, আমি আমার মেয়েকে আর কষ্ট দেব না।

সাজ্জাদ অবাক হয়ে দিলশাদের দিকে তাকিয়ে রইল। দিলশাদ বলল, সকালে আমি অফিসে চলে যাই। নানান কাজে সারাদিন ঘুরি। এইসময় তুমি এসে তোমার মেয়েকে সঙ্গ দিও। তোমার মেয়ের তোমাকে দরকার। আমার তোমাকে দরকার নেই।

সত্যি চলে যেতে বলছ?

হ্যাঁ, চলে যেতে বলছি। তোমাকে দেখেই আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। দুপুরে আমি কিছু খাই নি। খিদেয় আমার শরীর ঝিমঝিম করছে। তুমি আশেপাশে থাকলে আমি ভাত নিয়েও বসতে পারব না।

আমি চলে গেলে ভাত খেতে পারবে?

হয়তো পারব।

আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি। চা লাগবে না। তুমি খাওয়া-দাওয়া কর।

আমি নটার দিকে অফিসে চলে যাই। তুমি নটার পর চলে এসো।

আচ্ছা।

সাজ্জাদ প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে ঘর থেকে বের হলো। সে ভেবে পাচ্ছে না দুঃশ্চিন্তায় দুঃশ্চিন্তায় দিলশাদের মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে কিনা। তার আচার-আচরণ হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো। এই রোগ কখনো কমে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে।

রাস্তায় নেমেই সাজ্জাদ ঠোঁটে সিগারেট নিয়েছে কিন্তু ধরাবার কথা তার মনে নেই। সে হাঁটছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কোথায় যাবে তাও ঠিক করা নেই। এত রাতে কারো বাসায় ওঠা যাবে না, উঠতে হবে হোটেলে। সস্তাদরের হোটেল কোন অঞ্চলে আছে তাও মনে পড়ছে না। টাকা-পয়সা সে সামান্যই সঙ্গে এনেছে। এই মুহূর্তে মেয়ের অসুখের চেয়েও দিলশাদের ব্যবহার তাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে। রেল স্টেশনের দিকে চলে গেলে কেমন হয়? প্ল্যাটফরমে হাঁটাহাঁটি করে রাত পার করে দেয়া যায়। কিংবা সারারাত রাস্তায় হাঁটাও যেতে পারে। শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। শহরটা গত বিশ বছরে কত বড় হয়েছে সেটা তাহলে আন্দাজ করা যেত। তাতে অবশ্যি খোলা ক্ষুর হাতে হাইজ্যাকারের মুখোমুখি হবার আশঙ্কা থাকে। থাকুক না, আজ রাতে কোনো কিছুই ভয়ঙ্কর বলে মনে হবে না। ভোলা ক্ষুর হাতের হাইজ্যাকারদের দেখা পাওয়াও হবে a welcome change, বরং ওদের সে বলতে পারে- বন্ধুরা, তোমাদের খুশি করার মতো অর্থ আমার কাছে নেই। যা আছে তা অতি সামান্য। সেটা তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। প্লাস একটা হাতঘড়ি। ঘড়িটা দামি। পুরনো হলেও দামি। বিয়ের সময় শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া। তার বদলে আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল– টু নাইট লেট আস বি ফ্রেন্ডস। চল আজ রাতে একসঙ্গে নেশা-টেশা করি। সস্তায় নেশা করার জায়গা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা

আছে। বাংলা মদ এখন কী দরে বিক্রি হচ্ছে? হাঁড়ি কত? দামি বোতলে সুন্দর লেবেল সেঁটে এই জিনিস বিদেশে এক্সপোর্ট করলে বিদেশীরা বুঝত– আমরা কী জিনিস। বোতলের গায়ে টকটকে লাল অক্ষরে লেখা থাকবে বাংলা। ইংরেজি লেবেলেটা হবে এরকম

BANGLA

The fire from Bangladesh

তৃষ্ণায় সাজ্জাদের শরীর এখন কাঁপছে। তার কাছে মনে হচ্ছে কোনো নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে মদ্যপান করার সুযোগের বিনিময়ে সে এখন সবকিছুই দিয়ে দিতে পারে। তার আত্মাও বন্ধক রাখা যেতে পারে। আত্মা বন্ধক রাখার লোক মেসিফস্টোফিলিস কাব্যে পাওয়া যায়, বাস্তবে পাওয়া যায় না। বাস্তবের মানুষ আত্মা সম্পর্কে খুব আগ্রহী, তবে আত্মার কেনা-বেচায় আগ্রহী না। আগ্রহী কোনো মানুষকে পাওয়া গেলে সে তার আত্মা বিক্রি করে দিত। আত্মাবিহীন মানুষ হবারও নিশ্চিয়ই অনেক মজা আছে।

.

দিলশাদ নিঃশব্দে রাতের খাওয়া শেষ করল। তার যে এত খিদে পেয়েছিল সে আগে বুঝতে পারে নি। ঘন ডালটা খেতে এত ভালো হয়েছে! ডাল থাকলে আরো কিছু ভাত খাওয়া যেত।

ফুলির মা বলল, চা দিমু আম্মা?

দিলশাদ বলল, দাও! তোমার পান আছে না? সেখান থেকে আমাকে একটু পান দিও। পান খেতে ইচ্ছা করছে।

দিলশাদ বারান্দার দিকে রওনা হলো। নাতাশার ঘরের ভেতর দিয়ে যাবার সময় লক্ষ করল নাতাশা এই গরমে চাঁদর গায়ে শুয়ে আছে। তার চোখ বন্ধ, তবে দিলশাদ পুরোপুরি

নিশ্চিত নাতাশা জেগে আছে। সাজ্জাদের সঙ্গে তার কথাবার্তা কী হয়েছে সবই শুনেছে। সময় বিশেষে এই মেয়েটার ঘাপটি মেরে থাকার অভ্যাস আছে।

দিলশাদ বলল, মা, জেগে আছিস? নাতাশা জবাব দিল না। দিলশাদ বারান্দায় চলে গেল। আজ খুব গুমট। কিছুক্ষণ আগে গোসল করা হয়েছে, এর মধ্যেই গা ঘেমে যাচ্ছে। শোবার আগে আবার গোসল করতে হবে। ফুলির মা চা দিয়ে গেছে। খেতে ভালো লাগছে। দিনের শেষ চা ফুলির মা ভালো বানায়। এক কাপ শেষ করার পর আরেক কাপ খেতে ইচ্ছা করে।

ফুলির মা, নাতাশা রাতে দুধ খেয়েছে?

জে খাইছে।

সবটা খেয়েছে?

তলার মধ্যে অল্প একটু ছেল। আফার বমি আসতে ছেল, তখন চাচাজান। বলছেন, থাউক শেষ করনের প্রয়োজন নাই।

তোমার চাচাজান দুনিয়ার সবকিছু বেশি বোঝেন তো তাই বলেছেন— থাক প্রয়োজন নেই। এত বড় একটা অপারেশন হবে, অপারেশন সহ্য করার শক্তি লাগবে না? দুধ-টুধ না খেলে শক্তিটা আসবে কোত্থেকে? আকাশ থেকে?

কথা তো আম্মা ঠিকই বলছেন।

কাল তোমার চাচাজান আবার আসবে। ফোপরদালালি করতে চেষ্টা করবে। তখন কঠিন গলায় বলবে– আম্মার নিষেধ আছে। মনে থাকবে?

জে, মনে থাকব।

ভেতর থেকে নাতাশা ক্ষীণ গলায় ডাকল, মা! দিলশাদ তৎক্ষণাৎ উঠে গেল।

বাথরুমে যাব মা।

দিলশাদ হাত ধরে মেয়েকে বিছানা থেকে নামাল। ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল। আবার ফিরিয়ে এনে বিছানায় বসিয়ে দিল। কোমল গলায় বলল, আজ মাথাব্যথা হয়েছিল মা?

নাতাশা হাসিমুখে হা-সূচক মাথা নাড়ল যেন মাথাব্যথা হওয়াটা মজার একটা ব্যাপার।

কবার হয়েছিল?

তিনবার।

খুব বেশি?

হুঁ।

ব্যথার সময় ওষুধ খেয়েছিলি?

হুঁ।

তাতে কি ব্যথা কমেছিল?

হুঁ।

রাতের দুধ নাকি পুরোটা খাস নি?

বমি আসছিল মা।

বমি এলেও খেতে হবে। না খেলে শরীরে শক্তি আসবে না।

তুমি পান খাচ্ছ নাকি মা?

হ্যাঁ।

চপচপ করে পান খাওয়া আমার এত ভালো লাগে। আমাকে একটু পান দাও তো, আমি খাব। তোমার চাবানো পান একটু দাও।

আমার মুখের পান খেতে হবে না। দাঁড়া তোকে সুন্দর করে পান বানিয়ে দিচ্ছি।

না, তোমার মুখ থেকে দাও। কিচ্ছু হবে না।

অন্যের মুখের পান খাবি? ঘেন্না লাগার কথা। তোর ঘেন্না লাগে না?

উঁহু।

দিলশাদ নিতান্ত অনিচ্ছায় মেয়েকে পান দিল। নাতাশা পান চিবুতে চিবুতে সুন্দর একটা অভিনয় করল, হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলল, বাবা কোথায় মা?

দিলশাদ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, ও তার এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। কী নাকি দরকার। না গেলেই না। তুই কি এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলি?

হুঁ। বাবা আমাকে কিছু না বলে চলে গেল?

তুই ঘুমুচ্ছিলি বলে তোকে জাগায় নি।

রাতে ফিরে আসবে?

রাতে আর আসবে না। কাল সকালে চলে আসবে।

নাতাশা খুব ভয়ে ভয়ে ছিল হয়তো মা তার অভিনয় ধরে ফেলবে। মা'র যা বুদ্ধি! ধরে ফেলারই কথা। তবে খুব বুদ্ধিমান মানুষরাই সবচে বেশি বোকার মতো কাজ করে। নাতাশার ধারণা, বাবার সঙ্গে তার মা যে ঝগড়াটা করেছে তা নিতান্ত বোকা মেয়েরাই করবে। এবং এই যে সে মিথ্যা অভিনয় করছে শুধুমাত্র বোকা মায়েদেরই সেটা ধরতে পারার কথা না। একজন সাধারণ বুদ্ধির মা হলেও ধরে ফেলত। তার মা'র এত বুদ্ধি অথচ সামান্য ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা।

অভিনয়টা করে নাতাশার ভালো লাগছে। বাবা-মা কেউ জানবে না তাদের কুৎসিত ঝগড়া সে শুনেছে। তারা স্বস্তি বোধ করবে। এটা আনন্দিত হবার মতোই ঘটনা।

তোর বাবার সঙ্গে তুই কি অনেক গল্প-টল্প করেছিস?

হুঁ।

কী নিয়ে গল্প হলো?

সাইনবোর্ডের গল্পটা আবার শুনলাম। পুরোটা শোনা হয় নি। অর্ধেকটা বাকি আছে।

সাইনবোর্ডের কোন গল্প?

ঐ যে বাবা আর তার বন্ধুরা মিলে তাদের শহরের সব সাইনবোর্ড এক রাতে পাল্টে দিল। ছেলে হয়ে জন্মানোর কত মজা, তাই না মা? তারা কত কিছু করতে পারে?

দিলশাদ ভুরু কুঁচকে বলল, তুই কি তোর বাবার ঐসব বানানো গল্প বিশ্বাস করে বসে আছিস?

বানানো গল্প?

অবশ্যই বানানো গল্প। কয়েকজন মিলে এক রাতে সব সাইনবোর্ড খুলে অন্যখানে লাগাল। সাইনবোর্ড খোলা এত সহজ?

মার কথায় নাতাশা একটু মন খারাপ করল। সে জানে তার বাবার এই গল্পগুলি সত্যি গল্প। কিছু কিছু অদ্ভুত মানুষ পৃথিবীতে থাকে। তার বাবা একজন অদ্ভুত মানুষ। অদ্ভুত কোনো কিছু যদি তার মা'র মধ্যে থাকত তাহলে তার মাও হয়তো বাবাকে পছন্দ করত। মা'র মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই।

দিলশাদ বলল, ঘুম পাচ্ছে নাতাশা?

নাতাশার ঘুম পাচ্ছে না, তবু সে বলল, হ্যাঁ।

যা, শুয়ে পড়।

তুমি ঘুমুবে না?

আমি আরেকবার গোসল করব। আমার খুব গরম লাগছে।

দিলশাদ আবার দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করল। তার এত ক্লান্তি লাগছিল মনে হচ্ছিল গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে সে ঘুমিয়ে পড়বে। শরীর বেশি ক্লান্ত থাকলে ঘুমের খুব অসুবিধা হয়। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম চলে যায়।

দিলশাদ বাথরুম থেকে বের হয়ে দুটা রিলাক্সেন খেল। তার সঙ্গে একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। এই দুয়ের কম্বিনেশন ঘুমের জন্যে ভালো। রিলাক্সেন ট্যাবলেটের নিয়ম হলো খাওয়ার পর আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। ঝিমুনির মতো শুরু হলে বিছানায় যেতে হয়।

দিলশাদ ভেতরের বারান্দার পাটিতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। ঝিমুনি আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। কাল সারাদিনে অনেকগুলি কাজ করতে হবে। কোনটার পর কোনটা করা হবে একটু গুছিয়ে নেয়া দরকার।

১. আমেরিকান অ্যাম্বেসি থেকে ভিসা ফরম আনতে হবে।

২. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে একটা চিঠি বের করতে হবে। চিঠির বিষয়বস্তু হলো- নাতাশার অপারেশন দেশে হওয়া সম্ভব না বলে তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এই চিঠির জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনেক আগেই জমা দেয়া হয়েছে। এখন হঠাৎ করে তারা চাচ্ছে মেডিকেল বোর্ডের মতামত। চারজনের একটা মেডিকেল বোর্ড লাগবে। নাতাশার ডাক্তার বলেছেন মেডিকেল বোর্ডের মতামত ছাড়াই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠি বের করার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

৩. ফরেন কারেন্সি নেয়ার অনুমতির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে যেতে হবে। তাদের কী সব ফরম-টরম পূরণ করতে হবে। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠি ছাড়া ব্যাংকে গিয়ে লাভ হবে না।

৪. বিমানের অফিসে যেতে হবে। গুরুতর অসুস্থ রোগী নিতে হলে কী সব পারমিশনের ব্যাপার আছে। এইসব ছোটখাটো সমস্যা। দিলশাদ জানে এই জাতীয় সমস্যার সমাধান হয়। ছোটাছুটি করলেই হয়। বড় সমস্যা টাকার সমস্যা। দিলশাদ টাকা এখনো জোগাড় করতে পারে নি। বড় দুলাভাই এখনো টাকা দেন নি। তাকে পাওয়াই যাচ্ছে না। অফিসে নাকি কিছুদিন হলো কম আসছেন। কাল একবার তার নতুন অ্যাপার্টমেন্টে যেতে হবে। অফিস থেকে অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা নিয়ে রাত করে উপস্থিত হতে হবে।

অনেক যন্ত্রণা, অনেক ছোটাছুটি করে মাত্র তিন লাখ টাকা জোগাড় হয়েছে। সেই তিন লাখের এক লাখ চলে যাবে টিকিটে। দশ হাজার ইউএস ডলার আগেই হাসপাতালে জমা করতে হবে। নয়তো রোগী হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত করাবে না। প্রায় চার লাখ টাকা। কোত্থেকে জোগাড় হবে কে জানে! পরিচিত এমন কেউ নেই যার কাছে দিলশাদ যায় নি।

শুধু পরিচিত না, ভাসাভাসাভাবে পরিচিতদের কাছেও সে গিয়েছে। যেমন আনুশকার কাছে গেল। কলেজে একসঙ্গে পড়েছে, খুব হাই টাইপের মেয়ে। নিজে গাড়ি চালিয়ে আসত। তার জন্মদিনে সে ক্লাসের সব মেয়েকে রিভারক্রুজে নিয়ে গিয়েছিল। বিশাল এক জাহাজে করে ঢাকা থেকে চাঁদপুর যাওয়া, চাঁদপুর থেকে ফিরে আসা। গান-বাজনা, ম্যাজিক কত কিছুর ব্যবস্থা যে ছিল। খুঁজে খুঁজে সেই মেয়েকে সে বের করল। বারিধারায় প্রাসাদের মতো বাড়িতে থাকে। গেটে মিলিটারিদের মতো পোশাক পরা দারোয়ান। ভেতরে ঢোকাই মুশকিল। কেন আসা হয়েছে, কী দরকার, কী নাম সব কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। মেম সাহেব যদি সেই কাগজ দেখে সেখানে নিজের নাম সই করে দেন তবেই বাইরের লোক ঢুকতে পারবে। প্রায় একঘণ্টার মতো বসে থেকে দিলশাদ যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হলো তাকে ডাকা হবে না, তখনি ডাক পড়ল। সে খুবই আশ্চর্য হলো যে, আনুশকা তাকে চিনতে পারল। আনুশকা হাসিমুখে বলল, আরে তুমি? নাম দেখে চিনতে পারি নি। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, তাই না? লং ডিসটেন্ট কল রিসিভ করছিলাম। এখন বলো তো কী ব্যাপার। সামাজিক, সাক্ষাতের জন্যে নিশ্চয়ই আস নি।

দিলশাদ অতি দ্রুত তার সমস্যার কথা বলল। তার নিজেকে ভিক্ষুকের মতো লাগছিল, তারপরেও সে কথা শেষ করল। একটা ব্যাপার তার ভালো লাগল– আনুশকা ঘটনাটা মন

দিয়ে শুনল। অতি বড়লোকরা কোনো কিছুই মন দিয়ে শুনে না। তারা অল্পতেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। এই মেয়ে অধৈর্য হচ্ছে না বা হলেও প্রকাশ করছে না। দিলশাদ অনেক কষ্টে হাসি হাসি মুখ করে বলল, এখন আমি পরিচিত অপরিচিত সবার কাছে ধার চেয়ে বেড়াচ্ছি। নিজেও লজ্জিত হচ্ছি, যার কাছে চাচ্ছি তাকেও লজ্জায় ফেলছি।

আনুশকা বলল, না, লজ্জার কী আছে! তুমি কি কিছু খাবে, চা বা কফি?

না। আমি এখন উঠব।

ভরদুপুরে শুধু-মুখে যাবে এটা কেমন কথা? সরবত করে দি?

কিছু লাগবে না।

আনুশকা হাসিমুখে বলল, তা কি হয়? বসো একটু।

দিলশাদকে সরবত এবং পেস্ট্রি খেতে হলো। আনুশকা তার হাতে মুখবন্ধ একটা খাম দিয়ে বলল, আমার পক্ষে যা সম্ভব তোমাকে দিলাম। এটা তোমাকে ফেরত দিতে হবে না।

দিলশাদ রিকশায় উঠে খামের মুখ খুলল। মাত্র একটা চকচকে পাঁচশ টাকার নোট খামের ভেতর ভরা। আনুশকা তাকে ভিক্ষা হিসেবেই পাঁচশ’ টাকা দিয়েছে।

এই লজ্জা, এই অপমান কি কোনোদিন দূর হবে? কোনোদিন কি দিলশাদ আনুশকার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে?

রিকশায় যেতে যেতে দিলশাদ ঠিক করল অপারেশনের পর নাতাশা যখন সুস্থ হয়ে যাবে তখন তাকে নিয়ে ঐ বাড়িতে আবার যাবে। সঙ্গে থাকবে ফুলের তোড়া আর দামি কিছু উপহার। দিলশাদ বলবে, আনুশকা, আমার মেয়েটা ভালো হয়ে গেছে। তোমাকে মেয়েটা দেখাতে আনলাম। ওর নাম নাতাশা। তোমার টাকাটা আমার দুঃসময়ে খুব কাজ দিয়েছে। টাকাটা ফেরত দিতে এসেছি। সঙ্গে সামান্য উপহারও এনেছি। খুব খুশি হব যদি উপহারটাও নাও।

সাজ্জাদের কাপড় ব্যবসায়ী ধনী মামার কাছেও দিলশাদ গিয়েছিল। তিনিও আনুশকার মতোই গভীর আগ্রহ নিয়ে সবকিছু শুনলেন। অনেকবার আহা আহা করলেন। কোন ডাক্তার দেখছে এসব জানলেন, তারপর বললেন– টিউমারের সবচে ভালো চিকিৎসা কী জানো মা? সবচে ভালো চিকিৎসা হলো হোমিওপ্যাথি। ঠিকমতো তিনটা ডোজ পড়লে আর দেখতে হবে না। আমার কাছে একজনের ঠিকানা আছে। লালবাগে বসে গোলাম সারোয়ার। তার কাছে যাও– আমার নাম বলল। সে দেখুক।

দিলশাদ বলল, ওকে বাইরে নিয়ে যাবার আমি সব ব্যবস্থা শেষ করেছি। আমি আপনার কাছে ধার চাইতে এসেছি। লাখখানিক টাকা আপনি আমাকে দিন।

তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি মা? এক লাখ টাকা আমি ধার দেব কীভাবে?

আপনি পারবেন। আপনাকে টাকাটা আমি ফেরত দেব। ইন্টারেস্টসহ দেব। ব্যাংক যে হারে ইন্টারেস্ট দেয় সে হারে দেব।

ভদ্রলোক চোখ-মুখ শুকনা করে বললেন, তুমি তো মা আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ। আমাকে সুদের লোভ দেখাচ্ছ। আমি কি সুদের কারবার করি? এইরকম নোংরা কথা তুমি কীভাবে বলো?

বেশ তো, আপনি সুদ নেবেন না। আসলটাই আমি আপনাকে ফেরত দেব।

আসল আমি পাব কই? এক লাখ টাকা তো খেলা কথা না। এতগুলি টাকা কোন সাহসে তুমি ধার চাও তাও তো বুঝি না।

দিলশাদ চলে এসেছে। আসার পথে রিকশায় সে কাঁদছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে যে কাঁদছিল তা সে নিজে বুঝতে পারে নি। রাস্তার লোকজনদের অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে নিজের গালে হাত দিয়ে দেখে গাল ভেজা।

মানুষের অনেক বড় বড় স্বপ্ন থাকে। দিলশাদের এখন কোনো বড় স্বপ্ন নেই। তার সব স্বপ্নই ছোট ছোট স্বপ্ন। একসময় সে খুব স্বপ্ন দেখত। তার বারান্দাটা সে স্বপ্ন দেখার জন্যেই সাজিয়েছিল। এই বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে নানা কিছু ভাবতে তার ভালো লাগত। বারান্দা আগের মতোই আছে। সে বদলে গেছে। এখন সে ঘুমের ওষুধ খেয়ে বারান্দায় এসে বসে। অপেক্ষা করে। স্বপ্নের জন্যে অপেক্ষা করে না, ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করে।

অপেক্ষা করতে করতে দিলশাদ একসময় বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার সারা গায়ে মশা ভন ভন করতে লাগল। সে কিছুই টের পেল না।

৬. আজ ভিসা হলো

আজ ভিসা হলো। সবচে’ কঠিন অংশটাই বোধহয় সবচে’ সহজে হলো। ভিসা অফিসার আমেরিকান। তাঁর চোখমুখ কঠিন। ভুরু সবসময় কুঁচকানো। কিন্তু তিনি দিলশাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। চমৎকার বাংলায় বললেন, বিকাল তিনটার পর এসে পাসপোর্ট নিয়ে যাবেন।

দিলশাদ উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ভিসা কি হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ভিসা অফিসার আবারো হাসলেন। সেই হাসি দেখে দিলশাদের চোখ ভিজে ওঠার উপক্রম হলো। কিছুদিন হলো এটা হয়েছে। কেউ মমতা নিয়ে কিছু বললেই চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সেদিন অফিসে তার বস রহমান সাহেব তার কামরায় ডেকে পাঠালেন। দিলশাদ ভাবল কঠিন কিছু কথাবার্তা তাকে শুনতে হবে। সে দিনের পর দিন অফিস কামাই করছে। ছুটি নিচ্ছে না। ছুটি জমা করে রাখছে। কতদিন আমেরিকা থাকতে হয় কে জানে। সে রহমান সাহেবের ঘরে ঢুকল ভয়ে ভয়ে। প্রায় ফিস ফিস করে বলল, স্যার ডেকেছেন?

রহমান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, যা, বসুন। দিলশাদ ভয়ে ভয়ে বসল। রহমান সাহেব বললেন, আপনাকে কোনো কাজে ডাকি নি। আমার সাথে কফি খাওয়ার জন্য ডেকেছি। আপনি সারাক্ষণ এত টেনশনের ভেতর দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন দেখে মায়া লাগে। এত

চিন্তিত হবেন না। যা হবার হবে। নিন, কফি খান আর শুনুন। আপনার মেয়েকে নিয়ে যদি কোথাও যাবার দরকার হয় আপনি অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে যাবেন। আমি ট্রান্সপোর্ট সেকশানকে বলে দিয়েছি। অফিস টাইমের বাইরেও যদি গাড়ি লাগে, আমাকে বলবেন। আমার ড্রাইভার আছে, গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

দিলশাদ বলল, থ্যাংক য়্যু স্যার। বলতে বলতেই সে লক্ষ করল, তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। সে নিশ্চিত, রহমান সাহেব আর একটা কোনো মমতার কথা বললে সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলবে। ভাগ্যিস তিনি আর কোনো কথা বলেন নি। গম্ভীর মুখে কফির কাপে চুমুক দিয়েছেন। সেও কফি খেয়েছে একবারও তার দিকে না তাকিয়ে।

আজ আমেরিকান অ্যাম্বেসিতে সে এসেছে অফিসের গাড়ি নিয়ে। গাড়ি ছাড়া উপায় কী? নাতাশাকে আনতে হয়েছে।

নাতাশা এখন ওয়েটিংরুমে তার বাবার কাঁধে হেলান দিয়ে বসে আছে। নাতাশাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে না। সে বরং কৌতূহলী হয়ে ভিসাপ্রার্থীদের শুকনো মুখ দেখছে। কিন্তু সাজ্জাদকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। দিলশাদ সামনে এসে দাঁড়াতেই সাজ্জাদ বলল, ভিসা হয়েছে?

দিলশাদ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হুঁ।

আমাকেও দিয়েছে?

হুঁ।

থ্যাংক গড।

বিকেল তিনটার সময় এসে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে বলল।

দিলশাদ হাত ধরে মেয়েকে তুলল।

নাতাশা বলল, তুমি শুধু আমার হাতটা ধর মা। আমি নিজে নিজে হাঁটতে পারব।

নাতাশা হাঁটতে পারছিল না। এলোমেলো পা ফেলছে। ভিসাপ্রার্থীরা সবাই এখন তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাদের চোখে করুণা। নাতাশার খুব লজ্জা লাগছে। মানুষের করুণা গ্রহণ করার মতো লজ্জা আর কিছুতেই নেই।

সাজ্জাদের ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করার কোনোরকম ইচ্ছা দিলশাদের ছিল না। দুজনের যাবার টাকাই জোগাড় হচ্ছে না, ততীয় জন কীভাবে যাবে। সাজ্জাদ করুণ গলায় বলেছে– আমি যাব না, শুধু ভিসাটা করিয়ে রাখি।

যাবে না, তাহলে ভিসা করে রাখবে কী জন্যে?

শেষ মুহূর্তে যদি কিছু টাকা যোগাড় হয়ে যায়।

কোত্থেকে জোগাড় হবে? আলাদিনের চেরাগের কোনো সন্ধান পেয়েছ?

তা না। আমার স্কুল জীবনের বন্ধু করিম জার্মানিতে আছে। ওর ঠিকানা জোগাড় করার চেষ্টা করছি। ও জানতে পারলে আমাকে টিকিট পাঠিয়ে দিবে।

টিকিট পাঠানোর দরকার নেই। উনাকে টাকা পাঠাতে বলল। টাকা কিছুই জোগাড় হয় নি।

সাজ্জাদ বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, নাতাশার চিকিৎসার সব খরচ দেয়ার পরেও যদি কিছু থাকে তাহলেই আমি যাব।

তোমার এত আগ্রহ কেন? ঐ দেশে মদ সস্তা, এইজন্যে?

সাজ্জাদের কিছু কঠিন কথা মুখে এসে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলেছে। কী হবে কঠিন কথা বলে? কঠিন কথা তোলা থাকুক। কোনো এক সময় বলা যাবে। সাজ্জাদ নিজের পাসপোর্ট করিয়েছে এবং দিলশাদের সঙ্গে ভিসার জন্য পাঠিয়েছে। দিলশাদ মুখ কঠিন করে রেখেছে। মেয়ের কথা ভেবেই হয়তো কিছু বলে নি।

ভিসা পেয়ে দিলশাদের ভালো লাগছে। ভিসা পাওয়া যাবে না এরকম সন্দেহ কয়েকদিন থেকেই তার হচ্ছিল। তাছাড়া যার সঙ্গে দেখা হয়েছে সে-ই বলেছে– আমেরিকান ভিসা? অসম্ভব। ওরা ভিসা দেবে না। কিছুতেই না।

দিলশাদ বলেছে, না দেয়ার কী আছে? আমরা ঐ দেশে বাস করার জন্যে যাচ্ছি না, চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছি।

অন্যের চিকিৎসা নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা নেই। চিকিৎসা হলেই কী আর হলেই কী?

ভিসা অফিসাররাও তো মানুষ।

আমেরিকান ভিসা অফিসার মানুষ তোমাকে কে বলল? ভিসা অফিসার হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়ার আগেই অপারেশন করে ওদের মাথায় কম্পিউটার বসিয়ে দেয়। ওরা হলো যন্ত্র। যন্ত্রের বেশি কিছু না। তোমার যাবতীয় কাগজপত্র উল্টে-পাল্টে দেখবে। তারপর শুকনো গলায় বলবে, সরি! নো।

ব্যাপার তা হয় নি। দিলশাদ যে-রকম চেয়েছে সেরকমই হয়েছে। শেষপর্যন্তও তাই হবে। সে তার মেয়েকে নিয়ে ভর্তি করাবে জন্স হপকিন্সে। পৃথিবীর সেরা সব ডাক্তার দিয়ে মেয়েকে পরীক্ষা করাবে। অপারেশন হবে এবং তার মেয়ে সুস্থ হয়ে দেশে ফিরবে। মেডিকেল সায়েন্স অনেকদূর এগিয়ে গেছে। যারা এই বিজ্ঞানকে এতদূরে নিয়ে গেছেন দিলশাদ তাদের হাতেই মেয়েকে তুলে দেবে।

মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে সে কী করবে? প্রথমেই একমাসের ছুটি নেবে। এই একমাস দরজা বন্ধ করে শুধুই ঘুমুবে। এমনিতে ঘুম না এলে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুবে। তার শরীর-মন অসম্ভব ক্লান্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে ক্লান্তি দূর করবে।

নাতাশা গাড়িতে উঠেই বলল, মা'র অফিসের এই গাড়িটা খুব সুন্দর, তাই না বাবা?

সাজ্জাদ বলল, হ্যাঁ।

তোমার যদি কোনোদিন টাকা হয় এরকম একটা গাড়ি কিনো তো।

আচ্ছা মা কিনব। অবশ্যই কিনব।

দিলশাদ তিক্ত গলায় বলল, একটা খেলনা গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই, সে কিনবে পাজেরো। প্রমিজ করতেও লজ্জা লাগা উচিত।

নাতাশা মার দিকে তাকাল। সে মনে হয় বাবার পক্ষে কিছু বলতে যাচ্ছিল– বলল না। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

সাজ্জাদ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর মার অফিসের এই চমৎকার গাড়িতে করে শহরে কয়েকটা চক্কর দিলে কেমন হয়?

নাতাশা বলল, ভালো হয় বাবা, খুব ভালো হয়।

দিলশাদ বলল, ভালো হলেও চক্কর দেয়া যাবে না। গাড়ি অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। আমার অফিসে কাজ আছে। আমি অফিসে গাড়ি নিয়ে চলে যাব।

মা, তাহলে আমরা রিকশা নিয়ে একটু ঘুরি?

না। প্রচণ্ড রোদ। মাথায় রোদ লাগবে।

.

মেয়েকে রোদে ঘুরতে না দিলেও দিলশাদ নিজে অনেকক্ষণ একা একা রিকশা নিয়ে। ঘুরল। ভিসা হাতে পেয়ে তার খুব আনন্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মেয়ের সুস্থ হয়ে ওঠার প্রথম ধাপটি শেষ হয়েছে। এই তো পাসপোর্টে ছমাসের ভিসার সিল মারা। প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যা শুরু হয় তা শেষও হয়। একদিন এই প্রক্রিয়া শেষ হবে।

আনন্দিত মানুষ নিজের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চায়। আনন্দের খবর সবাইকে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করে। দিলশাদের পরিচিত জনের সংখ্যা সীমিত। সেই সীমিত সংখ্যক মানুষদের ঘরে ঘরে খবরটা পৌঁছাতে ইচ্ছা করছে। দিলশাদ প্রথম গেল কলাবাগানে তার মার কাছে।

হাদিউজ্জামান সাহেব বাড়িতে ছিলেন না। তিনি তার পীর সাহেবের কাছে গিয়েছেন। মনোয়ারারও যাবার কথা ছিল। দাঁতের ব্যথার কারণে তিনি যান নি। দুদিন ধরে তিনি দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। আজ সেই ব্যথা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে। গাল ফুলে একাকার।

দিলশাদ বলল, তোমার অবস্থা তো মা ভয়াবহ! তোমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

মনোয়ারা হাসলেন। দিলশাদ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এই অবস্থায় তুমি হাসছ কী করে মা?

মনোয়ারা বললেন, অনেকদিন পর তুই হাসিমুখে ঘরে ঢুকেছিস। তোর হাসিমুখ দেখে হাসলাম রে মা। আজ তোর মনটা খুশি কেন?

আজ ভিসা হয়েছে। ভিসা নিয়ে একটা দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিল– দেয় কি দেয় না। সেই দুঃশ্চিন্তা দূর হয়েছে। এখন টিকিট কাটব।

আলহামদুলিল্লাহ। আয় আমার সঙ্গে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ পড়।

থাক মা।

থাকবে কেন, আয়।

আমি অফিসের কাপড় পরে আছি। তেমন পরিস্কার নেই।

আমি পরিষ্কার শাড়ি দিচ্ছি। আয় তো মা। এখন থেকে বুঝলি মা, প্রতি পদে পদে আল্লাহর কাছে শোকরানা আদায় করে এগুবি দেখবি কোনো সমস্যা হবে না।

দিলশাদকে তার মা'র সঙ্গে নামাজ পড়তে হলো। অনেকদিন পর নামাজে দাঁড়িয়ে তার লজ্জা লজ্জা করছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছে এই বুঝি ভুল করবে। রুকুতে গিয়ে সিজদার দোয়া পড়ে ফেলবে।

নামাজের শেষে মনোয়ারা বললেন, মা আয়, দুজনে একসঙ্গে আল্লাহর কাছে দোয়া করি। হাত তোল। দুই মা একসঙ্গে আল্লাহর কাছে হাত তুলছে এটা অনেক বড় ব্যাপার। মা'দের ব্যাপারে আল্লাহপাকের দুর্বলতা আছে।

দিলশাদ হাত তুলল। মনোয়ারা বেগম প্রার্থনা শুরু করলেন। তাঁর গলার স্বর নিচু কিন্তু প্রতিটি বাক্য স্পষ্ট।

হে পরম করুণাময়। তুমি করুণা কর। অবোধ নিষ্পাপ শিশুকে তুমি ভয়াবহ ব্যাধি দিয়েছ। কেন দিয়েছ তা তুমিই জানো। আমরা অতি ক্ষুদ্র মানুষ তোমার, কাজ বোঝার সাধ্য আমাদের নাই। বোঝার চেষ্টাও করব না। শুধু আমরা আমাদের মনের কষ্টের কথা তোমাকে জানাই। তুমি কষ্ট দূর কর আল্লাহপাক। ছোট্ট শিশুটাকে মুক্ত করে দাও।...

মনোয়ারা বেগম দোয়া করছেন। দিলশাদের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। এমন ব্যাকুল হয়ে সে অনেকদিন কাঁদে নি। প্রাণভরে কাঁদার কারণেই হয়তো দিলশাদের মন খুব হালকা হয়ে গেল। নিজেকে তার এখন কিশোরী মেয়ের মতো লাগছে। বিয়ের আগে সে যেমন মাকে জড়িয়ে ধরে হৈচৈ চেঁচামেচি করত আজও সেরকম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দিলশাদ বলল, মা, তুমি আজ রাতে ভালো কিছু রান্না কর তো, আমি তোমার এখানে খাব।

কী খাবি বল?

তুমি যে কুচি কুচি করে ডিম দিয়ে আলু ভাজি কর ঐটা খাব।

শুধু আলু ভাজি? সঙ্গে আর কী খাবি?

তোমার দাঁতের যে অবস্থা– এই নিয়ে রাঁধবে কীভাবে? বরং আমাকে বলে দাও আমি রাধি।

দাঁতের ব্যথাটা এখন অনেক কমে গেছে। বুঝতে পারছি না কারণটা কী। তুই এরকম আরো কিছুক্ষণ হাসিমুখে থাকলে ব্যথাটা মনে হয় পুরোপুরি চলে যাবে।

মনোয়ারা হাসলেন। দিলশাদ বলল, তোমার বাগানে বসে চা খাব মা। চা বানিয়ে আন। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, তাই না মা?

আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হতেও পারে।

বৃষ্টি হলে তোমাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজব। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন তোমাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতাম। মনে আছে মা?

হুঁ, মনে আছে।

যতবার বৃষ্টিতে ভিজতাম ততবারই বড় আপার ঠাণ্ডা লেগে গলা-টলা ফুলে বিশ্রী অবস্থা হতো।

মনোয়ারা হাসতে হাসতে বললেন, তোর বড় আপার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। এখন বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না। বৃষ্টি হচ্ছে এই শব্দ শুনলেই তার ঠাণ্ডা লেগে গলা ফুলে যায়। ব্যাঙের ডাক শুনলেও বোধহয় তার এখন ঠাণ্ডা লেগে গলা ফোলে।

দিলশাদ খিল খিল করে হাসছে। মনোয়ারা মুগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি অনেকদিন পর তার অতি আদরের এই মেয়েটিকে এমন প্রাণ খুলে হাসতে দেখলেন।

মনোয়ারা তার এই বাগান নিজের হাতে করেছেন। বাগানের যে শৃঙ্খলা থাকে এখানে তা অনুপস্থিত। মনোয়ারা যেখানে যে গাছ পেয়েছেন লাগিয়েছেন। সম্প্রতি আঙুরের লতা লাগানো হয়েছে। লতা অনেকদুর উঠেছে। মাচা বেঁধে দিতে হয়েছে। একটা পানগাছ আগেই ছিল। সেই পানগাছ মানকচুর পাতার মতো বিশাল পাতা ছেড়েছে। বরই গাছ আছে, নারকেলি বরই। একবার এই বরই খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল। কয়েকটা বিচি নিজের হাতে পুঁতে দিলেন। একটি থেকে চারা বের হয়েছে। সেই চারা লক লক করে বাড়ছে। কাজি পেয়ারার কয়েকটা গাছ আছে– এখনো ফল ধরে নি। তার খুব শখ জলপদ্ম

লাগানোর। ছোট্ট বাগানে আর জায়গা নেই- তবু তিনি মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রেখেছেন। জায়গাটা খুঁড়ে জলাশয়ের মতো করে জলপদ্ম লাগাবেন। হাদিউজ্জামান সাহেবের ভয়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করতে পারছেন না।

দিলশাদ পানগাছের পাশে দাঁড়িয়েছিল। খুঁটি বেয়ে এই গাছ অনেকদূর উঠে গেছে। মনোয়ারা চা হাতে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দিলশাদ বলল, এটাই কি তোমার সেই বিখ্যাত পানগাছ?

হুঁ।

রাক্ষুসী পান বলে মনে হচ্ছে। এত বড় পাতা!

পাতাগুলি বেশি বড় হচ্ছে। এত বড় হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না।

খেয়ে দেখেছ?

হুঁ। আমি তো এখন এই পানই খাই।

খেতে কেমন মা?

খেতে ভালোই, একটু কষটা কষটা।

আমাকে একটু দিও তো তোমার রাক্ষুসী পান, খেয়ে দেখব।

দিলশাদ ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসল। মনোয়ারা বসলেন মেয়ের পাশে।

তোর টাকা কী পরিমাণ জোগাড় হয়েছে রে দিলু?

হয় নি।

হয় নি! তাহলে এত নিশ্চিত আছিস কীভাবে?

নিশ্চিত তোমাকে কে বলল মা?

তোকে দেখে কেমন নিশ্চিত মনে হচ্ছে।

আমার কাছে এই মুহূর্তে তিন লাখ টাকার সামান্য বেশি আছে। বড় দুলাভাই তিন দেবেন। তাঁকে খুব ধরব যেন আরো এক বেশি দেন। কত হলো? সাত? আপাতত আমি এই নিয়ে রওনা হব।

আরো তো লাগবে।

হ্যাঁ লাগবে। আমার স্কুল জীবনের বান্ধবী রীতা আছে মেরিল্যান্ডে। ওকে চিঠি লিখেছি। ও আমার থাকার ব্যবস্থা করবে। ও বলেছে আমেরিকায় অনেক বাংলাদেশী আছে। তাদের কাছ থেকে চাঁদা তুলবে। আগেও কয়েকবার এরকম তোলা হয়েছে। বিদেশে যেসব বাঙালি থাকেন, তাদের মন যে-কোনো কারণেই হোক—উদার হয়। ফেলো ফিলিংস থাকে। সমস্যা হবে না মা।

ইনশাল্লাহ্ বল দিলু। সমস্যা হবে না এ জাতীয় কথা কখনো বলবি না। সবসময় বলবি ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না।

দিলশাদ বলল, ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না।

মনোয়ারা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে এক হাত মেয়ের কাঁধে রেখে বললেন তোর জন্যে আমি কিছু টাকা রেখেছি।

দিলশাদ চমকে উঠে বলল, তুমি?

আমি তোকে বলেছিলাম না যেভাবেই হোক তোকে এক লাখ টাকা জোগাড় করে দেব।

বাবা তো দু লাখ টাকা দিয়েছেন।

তোর বাবারটা তোর বাবার। আমারটা আমার।

তুমি পেলে কোথায় এত টাকা?

তোর বাবার সবসময় ধারণা সে আমার আগে মারা যাবে— তখন আমি টাকা পয়সার সমস্যায় পড়ে যাব। আমার যাতে সমস্যা না হয় সেজন্যে সে পোস্টাফিসে পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখেছিল। ঐটা বেড়ে বেড়ে এখন এক লাখ হয়েছে।

সেই টাকা আমাকে দিয়ে দেবে?

হ্যাঁ, শুধু তোর বাবা না জানলেই হলো।

মনোয়ারা এখনো মেয়ের পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নেন নি। এখনো হাত দিয়ে রেখেছেন।

টাকাটা কি এখন নিবি দিলু? আমি উঠিয়ে রেখেছি।

দাও, এখনি দাও।

এতগুলি টাকা তুই একা নিয়ে যাবি?

কিছু হবে না। ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়ে যাব। আজকাল হাইজ্যাকাররা মেয়েদের ভ্যানেটি ব্যাগ নেয় না। তারা জানে মেয়েরা অনেক সাবধান। ভ্যানিটি ব্যাগ হাইজ্যাক করে কিছু পাওয়া যাবে না। হাইজ্যাকাররা অনেকবার 'ঠক খেয়েছে।

পাঁচশ টাকার দুটা বান্ডিল ভ্যানিটি ব্যাগে ভরতে ভরতে দিলু বলল, মা আমি চলোম।

সে-কী! তুই না বললি ভাত খাবি।

অনেক দেরি হয়ে যাবে মা। তাছাড়া আজ আমার দিনটা খুব লাকি। ভিসা হলো, তারপর হঠাৎ করে তোমার কাছ থেকে এতগুলি টাকা পেলাম। লাকি দিনটা এখানে বসে বসে নষ্ট করব না।

কী করবি?

বড় দুলাভাইকে ধরে আজই টাকার ব্যবস্থা করব। আমার মনে হচ্ছে আজ গেলে উনার টাকাটাও পাওয়া যাবে। আবার ইনশাল্লাহ বলতে ভুলে গেছি। ইনশাল্লাহ্।

এখন তার কাছে যাবি?

হুঁ।

সে নাকি আলাদা থাকে? ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। কী সব কাণ্ডকারখানা যে হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তোমার কোনো মেয়েরই স্বামীভাগ্য ভালো না মা।

মনোয়ারা ক্লান্ত গলায় বললেন, আমার মেয়েগুলিরও তো দায়িত্ব আছে। মেয়েরা তাদের দায়িত্ব দেখবে না। শুধু পরের ছেলেদের দোষ দেবে এটা ঠিক না।

তুমি এক অদ্ভুত মহিলা মা– শুধু নিজেদের দোষ দেখবে, অন্যদের দোষ দেখবে না। আগের যুগের জন্যে তুমি ঠিক আছ, এই যুগের জন্যে তুমি মা ঠিক না।

যে ঠিক সে সব যুগের জন্যেই ঠিক।

তুমি তর্ক করো না তো মা। আমার সঙ্গে তুমি তর্কে পারবে না। শুধু শুধু তর্ক করতে এসো না।

আচ্ছা যা তর্ক করব না।

আমার মেয়েকে তুমি দেখতে আস না কেন?

আছে একটা কারণ।

সেই কারণটা কী শুনি।

আমি আর তোর বাবা মিলে একটা খতম পড়ছি। খতম শেষ হলে দুজন একসঙ্গে গিয়ে তোর মেয়েকে দেখে আসব আর দোয়া করে আসব।

খতম শেষ হবে কবে?

লাগবে কয়েকদিন।

বাবার ঐ পীর যন্ত্রণা করছে, তাই না মা? তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়েও ভণ্ড পীরকে সহ্য করে যাচ্ছ। আশ্চর্য!

পীর ভণ্ড হতে পারে। কিন্তু আমরা তো পড়ছি আল্লাহপাকের কালাম। সেখানে তো মা কোনো ভণ্ডামি আমরা করছি না।

যা ইচ্ছা কর। মা আমি যাই।

আচ্ছা মা যা। টাকাটা সাবধান।

তুমি নিশ্চিত থাক তো মা। কেউ আমার এই টাকা নিতে পারবে না। টাকাগুলির মধ্যে আমার মেয়ের জীবন। কারো সাধ্য নেই কোনো মা'র কাছ থেকে মেয়ের জীবন ছিনিয়ে নেয়।

তুই কি এখন তোর বড় দুলাভাইয়ের কাছে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

ওর নতুন ফ্ল্যাটের ঠিকানা জানিস?

হুঁ।

ওকে বলিস তো আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে।

বলব।

দু-একদিনের মধ্যেই যেন দেখা করে।

বলব। মা যাই?

আচ্ছা মা যা। খোদা হাফেজ মা।

.

ধানমণ্ডির এই ফ্ল্যাট বাড়িটি খুব আধুনিক। মাত্র চারতলা উঁচু ফ্ল্যাট। কিন্তু লিফট আছে দুটি। এন্ট্রির লবি পুরোটাই শ্বেতপাথরের। ধুলোমাখা জুতা পায়ে পাথরের লবীতে উঠতেও সংকোচ লাগে। মেয়ে রিসিপসনিস্ট কোনো ফ্ল্যাট বাড়িতে এখনো দেখা যায় না। এই বাড়িতে আছে। চশমাপরা ধারালো চেহারার মেয়ে। দিলশাদকে দেখে সে শুদ্ধ ইংরেজিতে বলল, ম্যাডাম, আপনি কোথায় যাবেন?

দিলশাদ ওয়াদুদুর রহমানের নাম বলল। ফ্ল্যাট নাম্বার থ্রি-সি।

আপনার কি আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

জি-না।

স্যার ফ্ল্যাটেই আছেন। আমি একটু কথা বলে দেখি। আপনার কী নাম বলব?

বলুন দিলশাদ।

রিসিপসনিস্ট মেয়েটি ইন্টারকমে নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা বলেই রিসিভার দিলশাদের দিকে এগিয়ে দিল–স্যার লাইনে আছেন। কথা বলুন।

দিলশাদ রিসিভার হাতে নিল।

হ্যালো দিলশাদ।

জি দুলাভাই।

তুমি এসেছ খুব ভালো হয়েছে। মনে মনে তোমাকে এক্সপেক্ট করছিলাম।

তাই বুঝি?

অফকোর্স তাই। চলে এসো। লিফটে করে চারতলায়। ফ্ল্যাট বাড়ি কেমন দেখছ?

ফ্ল্যাটবাড়ি দেখলাম কোথায়? শুধু তো লবি দেখছি।

লবি কেমন সেটাই বলো।

অসাধারণ! একেবারে ইন্দ্রপুরী।

দিলশাদ তার দুলাভাইয়ের তৃপ্তির হাসি শুনল। হাসিটা একটু অস্বাভাবিক শুনাল– যদিও অস্বাভাবিক শুনানোর কোনো কারণ নেই।

ওয়াদুদুর রহমানের পরনে লুঙ্গি খালি গা। দিলশাদ কলিংবেলে হাত রাখার আগেই দরজা খুলে ওয়াদুদুর রহমান বলল, সুস্বাগতম।

দিলশাদ বলল, জুতা বাইরে রেখে ঢুকব, না জুতা পায়ে ঢুকব? যে অপূর্ব ফ্ল্যাট, জুতা পায়ে ঢুকতে সাহস হচ্ছে না।

ওয়াদুদুর রহমান খুশি খুশি গলায় বলল, ঢং করবে না দিলু। এসো এসো, ঘরে পা দাও।

সে দিলুর হাত ধরে ভেতরে টেনে নিল। দিলু একটু সংকোচিত বোধ করছে। দিলু ঢুকতে যাচ্ছে, তাকে হাত ধরে টানাটানির প্রয়োজন ছিল না।

ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন কেমন দেখছ?

খুব সুন্দর। শুধু এই সুন্দরের ভেতর লুঙ্গি পরা খালি গায়ে আপনাকে মানাচ্ছে না। বাংলা ছবির বিত্তবান বাবাদের মতো আপনার গায়ে থাকা উচিত ছিল রোব টোব জাতীয় কিছু। ফ্ল্যাটে আপনি একা?

অবশ্যই আমি একা একা থাকার জন্যে ফ্ল্যাট কিনেছি। পর্বত পাশে নিয়ে ঘুমানোনার জন্যে ফ্ল্যাট কিনি নি।

আপা এই ফ্ল্যাট দেখে নি?

কোত্থেকে দেখবে? ইচ্ছে করলেও তো ঢুকতে পারবে না। গেটেই আটকে দেবে। তাছাড়া তার যে সাইজ হয়েছে, লিফটের দরজা দিয়েও সে ঢুকবে না। ধাক্কাধাক্কি করে ঢোকাতে হবে। কার ঠেকা পড়েছে তাকে ধাক্কাধাক্কি করার? ফরগেট ইওর বড় আপা, তুমি আমার সঙ্গে এসো ফ্ল্যাটটা আগে ভালোমতো দেখাই–গাইডেড ট্যুর। আসলেই দর্শনীয়। প্রথম কী দেখবে? কিচেন?

যা দেখাবেন তাই দেখব।

দিলু কিচেন দেখে মুগ্ধ গলায় বলল, কিচেনেও কি এয়ারকুলার লাগিয়েছেন না কি?

ওটা এয়ারকুলার না দিলু। রান্নার ধোয়া শুষে নেবার ব্যবস্থা।

টেবিলটা কি শ্বেতপাথরের দুলাভাই?

হ্যাঁ শ্বেতপাথরের। রান্নাঘরে বসে যেন দুজন খেতে পারে সেই ব্যবস্থা। কিচেনে টেবিল থাকলে ফরম্যাল ডাইনিং রুমে যাবার দরকার হয় না।

আপাকে তো আনছেন না– দুজন পাচ্ছেন কোথায়?

এই তো তোমাকে পেলাম। আজ এই শ্বেতপাথরের টেবিল উদ্বোধন করব। দুজন এখানে ডিনার করব। কী খেতে চাও বলো– ইন্টারকমে খবর দিয়ে দেব। ওরা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে আসবে। এখন এসো তোমাকে মাস্টার টয়লেট দেখাব। দর্শনীয়। গোল একটা বাথটাব ফিট করা হয়েছে। বাথটাবটার ডিজাইন এমন যে দুজন গোসল করতে পারে। বিদেশীদের আইডিয়া কত সুন্দর দেখ। এরা জানে জীবনকে কীভাবে উপভোগ করতে হয়। আমরা শুধু টাকা রোজগার করতেই জানি, খরচ করতে জানি না।

আপনি তো মনে হয় খরচ করতেও জানেন।

আমি এখনো জানি না। তবে আমি শিখছি। বাচব আর কতদিন, মরে গেলেই তো সব শেষ। ঠিক না? বাথরুমটা পছন্দ হয়েছে?

খুব সুন্দর।

এসো বারান্দা দেখাই। তোমার মনে হতে পারে আর্কিটেক্ট জায়গা নষ্ট করেছে- আসলে তা না। বারান্দাটাই বাড়ির বিউটি। দুজনে বসার জন্যে লো হাইট সোফা রাখা হয়েছে বারান্দায়। বারান্দায় বসে বসে চাঁদের আলো দেখবে– হাতে থাকবে মিষ্টি শেরির গ্লাস, ক্যাসেটে বাজবে সিম্ফোনি– দ্যাটস লাইফ। ঠিক না?

বুঝতে পারছি না। হয়তো ঠিক।

এসো বারান্দায় বসি, না চল শোবার ঘরে চল–এই একটি ঘরেই এসি আছে। একবার ভেবেছিলাম শোবার ঘরে ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট দেব। তারপর মনে হলো গরমের দেশে কার্পেট ভালো লাগবে না। ঝকঝকে হোয়াইট সিমেন্টই ভালো। এখন কী দেব বলো? চা, না ঠাণ্ডা কিছু?

দুলাভাই আজ সারাদিন আমি বাইরে, জরুরি কিছু কথা বলে চলে যাব।

বলো তোমার জরুরি কথা।

আজ ভিসা পেয়েছি।

একসেলেন্ট। আসল হার্ডেল হচ্ছে ভিসা।

ঠিক করেছি পরশু টিকিট কাটব।

পরশু কেন? হোয়াই নট টুমরো? আমার এক বন্ধুর ট্রাভেল এজেন্সি আছে। এরা কোনোরকম কমিশন না কেটে টিকিট দেবে। হাজার দশেক টাকা সেভ করতে পারবে।

থ্যাংক য়্যু দুলাভাই। তারচে' আমার যেটা বেশি দরকার তা হচ্ছে...।

আমি তোমাকে যে টাকা প্রমিস করেছিলাম সেটা তো?

জি।

আজ তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কারেন্ট অ্যাকাউন্টের চেক বই এইখানেই আছে। আমি এক্ষুনি চেক লিখে দিচ্ছি। যেহেতু কারেন্ট অ্যাকাউন্টের চেক তুমি কালই ভাঙাতে পারবে।

দুলাভাই, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব- বুঝতে পারছি না।

মেয়ে সুস্থ হয়ে আসুক তারপর ধন্যবাদ দেবে। এখন বলল যা দেব বলেছিলাম তাতে হবে, না আরো কিছু লাগবে? ফিল ফ্রি।

যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আরো এক বাড়িয়ে দিন।

তোমার জন্যে সবই সম্ভব। যাও এটাকে চার করে দিচ্ছি। এখন বলল রাতে চায়নিজ খাবে, না বাংলাদেশী ফুড– ডাল ভাত। গুলশানে একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছে একসেলেন্ট বাংলাদেশী ফুড করে। বিদেশীরা লাইন দিয়ে খায়।

দুলাভাই, আজ আমি চলে যাব। আরেকদিন এসে আপনার সঙ্গে ডিনার করব।

পাগল হয়েছ! তোমাকে যেতে দেব না। তোমাকে দিয়ে রান্নাঘরের শ্বেতপাথরের টেবিল উদ্বোধন করা এবং গোল বাথটাব উদ্বোধন করাব। হা হা হা।

দিলশাদ অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মানুষটা কী বলার চেষ্টা করছে?

ওয়াদুদুর রহমান বেড সাইড টেবিলের ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। ঠোঁটে সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে বলল, দিলু, আমি হচ্ছি খুব ফ্রাস্টেটেড একজন মানুষ। পুরোপুরি হতাশাগ্রস্ত। এক অর্থে তুমিও হতাশাগ্রস্ত। দুজন হতাশাগ্রস্ত মানুষ যদি কিছু সময় আনন্দে কাটায় তাতে জগতের কোনো ক্ষতি হয়।

দুলাভাই, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না পারার তত কোনো কথা না দিলু। তুমি তো বোকা মেয়ে নও। তোমার জায়গায় তোমার আপা হলে ভিন্ন কথা ছিল। সে কিছুই বুঝত না। বিয়ের পর পর কী ঘটনা ঘটল শোন রাত একটার দিকে তোমার আপাকে ডেকে তুলে বললাম, তৃষ্ণা পেয়েছে। পানি খাব। সে ভাবল পানির তৃষ্ণাই বুঝি পেয়েছে। সে বিস্মিত হয়ে বলল, টেবিলেই তো পানির জগ আছে। গ্লাস আছে। খেয়ে নিলেই পারতে। আমাকে শুধু শুধু ডাকলে কেন? আমি তখন বললাম...।

দিলশাদ বলল, আমাকে এসব কেন শুনাচ্ছেন?

ওয়াদুদুর রহমান ডানহাত বাড়িয়ে দিলশাদের গালে রাখল। আদর করার ভঙ্গিতে হাত রাখা। দিলশাদ নিজের মুখ সরিয়ে নিল না, সে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। ওয়াদুদুর

রহমানের ডানহাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেটের ধোয়ায় দিলশাদের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে।

ওয়াদুদুর রহমান অন্যহাত দিলশাদের কোলে রেখেছে। অনেকদিন আগে সিনেমাহলে এই ব্যাপার হয়েছিল।

দুলাভাই, আপনি ঠিক করে বলুন তো আপনি আমার কাছে কী চাচ্ছেন?

আমি নিজ থেকে কিছু চাইব না। তুমি যা দেবে তাই হাসিমুখে নেব। হা হা হা।

ওয়াদুদুর রহমান দিলশাদের দিকে আরেকটু ঝুঁকে এলো। দিলশাদ বলল, দুলাভাই, আমার গায়ের উপর উঠে পড়ার আগে একটা কথা শুনুন। প্লিজ স্টপ দেয়ার। আমার গাল থেকে আপনার হাত সরান। হ্যাঁ, এখন তাকান আমার দিকে। আমাকে বেশ কিছু টাকা আপনি দিচ্ছেন। তার পূর্বশর্ত কি এই যে, আমাকে আপনার সঙ্গে বাথটাবে বসে গোসল করতে হবে? আপনার সঙ্গে আমাকে বিছানায় যেতে হবে?

তুমি পুরো ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখছ দিলু। অন্যভাবে দেখার দরকার নেই– আমরা দুজনই র‍্যাশানাল হিউমেন বিং...।

দুলাভাই, আপনার টাকার আমার দরকার নেই।

দরকার না থাকলে খুব ভালো কথা। দরকার নেই বলেই তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে কেন?

আমি তো আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছি না। আপনি করছেন। কতটুক খারাপ ব্যবহার যে করেছেন তাও আপনি জানেন না।

দিলশাদ উঠে দাঁড়াল। ওয়াদুদুর রহমান স্বাভাবিক গলায় বলল, চলে যাচ্ছ?

দিলশাদ জবাব না দিয়ে দরজা খুলে বের হয়ে এলো। সে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। একহাতে রেলিং ধরে নামছে, তারপরেও মনে হচ্ছে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

৭. মার কিছু একটা হয়েছে

মা'র কিছু একটা হয়েছে। ভয়ঙ্কর কিছু। রাত আটটায় মা বাসায় ফিরলেন– আমি তাঁকে দেখেই চমকে উঠলাম। মা বললেন, তোর বাবা কোথায়? চলে গেছে? আমি বললাম, হু। মা ক্লান্ত ভঙ্গিতে আমার খাটের পাশে বসলেন। বসেই রইলেন। যেন রক্ত-মাংসের মানুষ হঠাৎ মূর্তি হয়ে গেছে।

অন্যদিন বাসায় ফিরে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন– মাথাব্যথা হয়েছিল? তারপর কিছুক্ষণ মাথায় হাত রাখেন। মনে হয় মনে মনে কোনো দোয়া পড়েন। মা কিছুদিন হলো দোয়া পড়া শুরু করেছেন। দরূদে শেফা। অনেক রাত জেগে পড়েন, তারপর চুপিচুপি এসে কপালে ফুঁ দিয়ে যান। আমি জেগে থেকেও ঘুমিয়ে থাকার ভান করি।

মা'র মন আজ খুব ভালো থাকার কথা। আজ আমাদের ভিসা হয়েছে। কোনোরকম সমস্যা ছাড়াই হয়েছে। ভিসা হবার পর মা আমাকে আর বাবাকে বাসায় নামিয়ে রেখে চলে গেলেন। যাবার সময় হঠাৎ কী মনে করে বাবাকে বললেন, তুমি রাতে ভাত না খেয়ে চলে যাও কেন? আজ ভাত খেয়ে যাবে।

মার কথা শুনে বাবা যেমন আশ্চর্য হলেন, আমিও হলাম। অনেকদিন পর এই প্রথম মা বোধহয় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাবার সঙ্গে কথা বললেন। আমার ধারণা, বাবাকে তিনি রাতে থেকে যেতে বলতেন। চক্ষুলজ্জার জন্যে বলতে পারলেন না। সেই মা'র কী হলো? এমন মন খারাপ করে ফিরলেন কেন?

আমি মার দিকে তাকিয়ে কারণটা ধরতে চেষ্টা করলাম। একটা কারণ হতে পারে– মা সব ঠিকঠাক করার পর হঠাৎ ধরতে পেরেছেন– সবই অর্থহীন।

মা ডাকলেন, ফুলির মা!

ফুলির মা দরজা ধরে দাঁড়াল। তার এখন ধমক খাওয়ার কথা। দরজা ধরে দাঁড়ালেই মা ধমক দেন। কিন্তু আজ সে ধমক খেল না। মনে হচ্ছে সে যে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে মা যেন এটা দেখতে পাচ্ছেন না। ফুলির মা বলল, আম্মা কী?

মা এই প্রশ্নে কেমন যেন বিব্রত হলেন। মনে হচ্ছে কেন ফুলির মাকে ডেকেছেন তা তিনি ভুলে গেছেন।

চা দিমু আম্মা?

না।

শীতল পানি দিমু?

আচ্ছা তুমি যাও।

ফুলির মা চলে গেল। একবার ভাবলাম মাকে জিজ্ঞেস করি তোমার কী হয়েছে মা? তারপর মনে হলো কেউ যখন খুব কষ্টে থাকে তখন প্রশ্ন করে কষ্টের ব্যাপারটা জানতে নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কষ্টের উপর প্রলেপ পড়ে। তখন জিজ্ঞেস করা যায়। প্রলেপ বাড়ার আগেই কষ্টের ব্যাপার জানতে চাইলে কষ্টটা অসহনীয় হয়ে ওঠে।

এই থিওরি আমার বাবার কাছ থেকে শোনা। বাবা থিওরি দেবার মধ্যে খুব ওস্তাদ। মার ধারণা অকর্মণ্য, অপদার্থ লোক থিওরি দেয়াতে ওস্তাদ হয়। এরা কাজ জানে না। থিওরি জানে। মা'র কথা সত্যি হলেও হতে পারে। আমি দেখেছি মার কথা সাধারণত সত্যি হয়। বাবার সাইনবোর্ড উল্টানোর গল্পটা শুনে মা বললেন– এটা মিথ্যা গল্প। বানিয়ে বানিয়ে বলছে। মার কথা শুনে আমার খুব রাগ হয়েছিল। গতকাল বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম।

ঠিক করে বলো তো বাবা গল্পটা কি সত্যি? মা বলছে মিথ্যা গল্প।

এই গল্পের সত্যি-মিথ্যা তোর মা বলবে কীভাবে? সে তো সাইনবোর্ড বদলানোয় ছিল না।

তুমি তাহলে সাইনবোর্ড বদলেছ?

প্রায় আর কী!

প্রায় মানে কী?

এই জাতীয় একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল... হাতুড়ি, পেরেক সবই জোগাড় করা হলো...।

শেষপর্যন্ত আর বদলাও নি, তাই না?

হুঁ।

বাবার কথায় আমরা মনটা বেশ খারাপ হলো। মজার একটা ঘটনা বাবা ঘটিয়েছিলেন এটা ভেবে যে কতবার একা একা খিলখিল করে হেসেছি– আর কখনো হাসতে পারব না। মনে মনে ভাবা এককথা, আর সত্যিকার কাজটা করে ফেলা অন্যকথা। আমি তো কত কিছুই ভাবি কিন্তু কিছুই করি না। মানুষের করার ক্ষমতার চেয়ে ভাবার ক্ষমতা লক্ষগুণ বেশি।

.

মা আমার পাশে বসে আছেন। তিনি এখন নিশ্চয়ই আকাশ-পাতাল কত কী ভাবছেন। কী ভাবছেন তা জানতে ইচ্ছা করছে। মানুষ কী ভাবে তা জানার ব্যবস্থা থাকলে খুব ভালো হতো। ভাবনাটা যদি চোখের মণিতে ভেসে উঠত! সেটাও বোধহয় সম্ভব না। মানুষ একসঙ্গে দুটা-তিনটা ভাবনা ভাবতে পারে। চোখের মণিতে তো আর একসঙ্গে দুটা-তিনটা ছবি ভাসতে পারে না।

মা একটু নড়েচড়ে বসলেন, তারপর বললেন, নাতাশা, তোর বাবা এত সকাল সকাল চলে গেল কেন?

আমি জবাব দিলাম না। এই প্রশ্ন মা আমাকে করেন নি। নিজেকেই করেছেন। মানুষ নিজেকে সরাসরি প্রশ্ন করতে ভয় পায়। এইজন্যে বেশিরভাগ সময়ই নিজেকে করা প্রশ্ন অন্যকে করে। তবে অন্যের কাছে থেকে সে জবাব শুনতে চায় না। কেউ জবাব দিলে তার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকায়।

আমার ধারণা, মা কোনো বড় সমস্যায় পড়ে গেছেন। এই সমস্যায় বাবা কোনো না কোনোভাবে জড়িত বলে বারবার তার বাবার কথা মনে পড়ছে।

মা উঠে দাঁড়ালেন এবং আজ সারাদিন আমি কেমন ছিলাম, আমার ব্যথা উঠেছিল কি-না তা না জিজ্ঞেস করেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তার ঘরের দরজা বন্ধ করার ঘটনাটাও অনেকদিন পর প্রথম ঘটল। আমার অসুখের পর থেকে তিনি দরজা বন্ধ করেন না।

আজ আমার শরীর ভয়ঙ্কর রকম খারাপ করেছিল। সেই ভয়ঙ্কর যে কী রকম ভয়ঙ্কর তা আমি বাবা এবং ফুলির মা'র দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি। এরকম ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থা আমার বেশি হয় না। খুব কমই হয়। মা এটা এখনো দেখেন নি। কারণ যে ক'বার এই অবস্থা হলো– সে ক'বারই মা অফিসে। ব্যাপারটা জানল শুধু ফুলির মা। আমি তাকে বললাম, ফুলির মা, তুমি মা'কে এটা কখনো বলবে না। খবরদার। যদি তুমি মাকে বলে দাও তাহলে আমি কোনোদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না। :

মা'কে ব্যাপারটা জানাতে চাই নি– কারণ মা'কে জানিয়ে কী হবে? শুধু শুধু তার কষ্ট লক্ষগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। তিনি অফিস-টফিস সব ছেড়ে দিন-রাত আমার বিছানার পাশে বসে থাকবেন। এতে যদি আমার লাভ হতো আমি নিজেই মা'কে বলতাম। লাভ তো কিছু হতো না। বরং এই যে মা অফিসে যাচ্ছে এতেই আমার লাভ হচ্ছে। আমি আশায় আশায় সময়টা কাটাচ্ছি– মা কখন ফিরবে? ফিরলে কী কী গল্প করব?

মানুষ তার জীবনের আনন্দের গল্পগুলি অন্যকে জানাতে চায়। দুঃখ এবং কষ্টের কথা কাউকে জানাতে চায় না। আমিও আমার কষ্টের ব্যাপার কাউকে জানাতে চাই না। কাউকেই

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

না। আমি আমার কষ্টের ব্যাপারগুলি নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে চাই। মা নিজেও তো আমাকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। যখন ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে গেলাম তখন মা যে কী কাণ্ড করল! এক গাদা মিষ্টি কিনে নিয়ে এসে আমাকে বলল, চল রে নাতাশা, ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতে মিষ্টি দিয়ে আসি।

কারো বাসায় যেতে আমার খুব খারাপ লাগে। তারপরেও মা'র উৎসাহ দেখে বললাম, চল যাই। মা সবকটা ফ্ল্যাটে গেলেন। কী আনন্দ নিয়েই না মেয়ের রেজাল্টের কথা বললেন! আমার রেজাল্টের কথা শুনে অন্যরা কে কী করছে তা আমি দেখলাম না আমি শুধু মুগ্ধচোখে মাকেই দেখছিলাম। মা আমাকে যখন ফোর-বি ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন তখন মজার একটা ব্যাপার হলো। ফোর-বি ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা (তার অনেক বয়স। প্রায় আমার নানিজানের কাছাকাছি) দরজা খুলে হাসিমুখে বললেন– আরে নাতাশা, তুমি? আমি অবাক হলাম ভদ্রমহিলা আমার নাম জানেন দেখে। আমি তাকে কোনোদিন দেখিও নি। মা তাকে আমার রেজাল্টের কথা বললেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা এমন হৈচৈ শুরু করলেন। প্রথমেই চিৎকার করে উঠলেন– ও আল্লা, ও আল্লা, এ কী কাণ্ড! এ কী কাণ্ড! তারপর ছুটে গেলেন টেলিফোন সেটের কাছে। তিনি টেলিফোনে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছেন। আমি আর মা শুনছি।

হ্যালো! শোন শোন, তুমি যে প্রায়ই বলতে আমাদের ফ্ল্যাট বাড়িতে একটা পাগলা মেয়ে আছে– বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা একা কথা বলে আর হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দেয়– সেই মেয়ে আর তার মা এসেছে। এই তত দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। এই শোন, মেয়েটা ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায় ফাস্ট হয়েছে।

আমার আনন্দের খবরটা মা ঘরে ঘরে গিয়ে দিয়ে এলেন। কিন্তু অসুখের ব্যাপারটা কাউকে বললেন না। অনেকে নিজ থেকে খবর পেয়ে দেখতে এলো, মা তাদের কাউকেই আমার কাছে আসতে দিলেন না। শুকনো গলায় বললেন, কিছু মনে করবেন না, ওর কাছে যাওয়া ডাক্তারের নিষেধ আছে। কেউ ওকে দেখতে গেলে ও মনে কষ্ট পায়, সেটা ওর ক্ষতি করে। মার কঠিন নিষেধের জন্যে কেউ আর কাছে আসতে পারল না শুধু ঐ মহিলা আসতেন। মা যখন অফিসে তখন আসতেন। মা সেটা জেনে ফেলে একদিন খুব রাগারাগি করলেন। তারপরেও উনি আসতেন। আমার একটা হাত কোলে নিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যেতেন। কোনো গল্প না, কিছু না। গল্প আমি করতাম, উনি শুধু শুনতেন। উনি আমাকে খুব দামি একটা কলম আর একটা খাতা দিয়েছেন। এত সুন্দর খাতা আমি জন্মে দেখি নি। মলাটটা হালকা বেগুনি ভেলভেটের। খাতাটা হাতে নিলেই গালে ছোঁয়াতে ইচ্ছা করে। এখন পর্যন্ত ঐখাতায় আমি কিছু লিখি নি। আমি ঠিক করে রেখেছি আমেরিকা যাবার আগে সবার জন্যে ঐ খাতায় একটা করে চিঠি লিখে যাব। ফুলির মা'র জন্যেও লিখব।

আমার মৃত্যুর খবর এলে ফুলির মা কতটা কষ্ট পাবে তা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে। মনে হয় খুব একটা পাবে না। বাবার এই ব্যাপারে একটা থিওরি আছে– আনন্দ পাবার ক্ষমতা যার যত বেশি, কষ্ট পাবার ক্ষমতাও তার তত বেশি।

ফুলির মা'র আনন্দ পাবার ক্ষমতা একেবারেই নেই। তাকে গত ঈদের আগের ঈদে মা খুব ভালো একটা শাড়ি কিনে দিল। অনেকদিন পর দেশে যাচ্ছে ভালো একটা শাড়ি পরে যাক। শুধু শাড়ি না শাড়ির সঙ্গে স্যান্ডেল, গায়ে দেয়ার একটা চাঁদর। তার সাতশ টাকা পাওনা হয়েছিল। মা তাকে এক হাজার টাকা দিয়ে বলল, তোমার কাজকর্ম, চাল চলন,

বিড়ি সিগারেট খাওয়া সবই অসহ্য; তারপরেও তুমি ছিলে বলে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তুমি চলে যাবার পর বাসাটা খালি খালি লাগবে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো।

কথা বলতে গিয়ে মার গলা ধরে গেল, কিন্তু ফুলির মা নির্বিকার ভঙ্গিতে কর্কশ গলায় বলল, আমার নিজেরও ঘর-সংসার আছে। কইলেই আওন যায় না।

তাকে যে এত কিছু দেয়া হলো সেটা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। যাবার সময় আমাকে বলে পর্যন্ত গেল না। নতুন শাড়ি, স্যান্ডেল পরে, গট গট করে রিকশায় গিয়ে উঠল। ফুলির মা চলে যাবার পর আমার তার জন্যে এত খারাপ লাগল যে আমি দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদলাম।

এই যে ভালোবাসা আমি ফুলির মা'র প্রতি দেখালাম সে কি সেই ভালোবাসা ফেরত দেবে না? বাংলা আপার কথা অনুযায়ী দেয়া উচিত। মনে হয় সে আমার জন্যে কাঁদবে। তবে খুব অল্প সময়ের জন্যে কাঁদবে। আমার মনে আছে তার নিজের মেয়ে ফুলির মৃত্যুর খবর পেয়েও সে খুব অল্প সময়ের জন্যে কাঁদল। 'ফুলিরে, ও ফুলি, ও ধন, ও আমার মানিকরে' বলে হাউমাউ করে কিছুক্ষণ কেঁদে বালতি ভর্তি কাপড় নিয়ে বাথরুমে কাপড় ধুতে গেল। বাবা বললেন, ফুলির মা, থাক আজ কাপড় ধোয়ার দরকার নেই।

ফুলির মা রাগী গলায় বলল, কাম ফালাইয়া থুইয়া কোনো লাভ আছে? কাপড় ধুইব কে? আফনে ধুইবেন?

বাথরুমে কাপড় ধুতে ধুতে সে আরেকবার ‘ফুলিরে, ও ধন রে, ও আমার মানিকরে’ বলে চেঁচিয়ে উঠেই পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেল। আর কোনোদিন তাকে ফুলির জন্যে কাঁদতে শুনি নি।

আমার জন্যেও সে হয়তো দুবার কাদবে। একবার মৃত্যুর খবর শুনে কাদবে। আরেকবার কোনো একটা কাজ করতে করতে কাদবে। তবে বেশিও কাঁদতে পারে। নিজের মেয়েকে সে তো কখনো কাছে পায় নি। আমাকে কাছে পেয়েছে। নিজের মেয়ের প্রতি তার যে ভালোবাসা ছিল তার সবটাই নিয়ে নিয়েছি আমি। আমার যখন সেই ভয়ঙ্কর মাথাব্যথাটা হয় ঘরে যখন সে আর আমি ছাড়া কেউ থাকে না তখন অসহ্য ব্যথা নিয়েও অবাক হয়ে ফুলির মা’র কাণ্ডকারখানা আমি দেখি। আমার বড় মায়া লাগে।

প্রথম কিছুক্ষণ সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চেহারা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। দ্রুত তার ঠোঁট নড়তে থাকে। মনে হয় সে তখন কোনো দোয়া পড়তে থাকে। আমি বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকি, সে দরজা ধরে ছটফট করতে থাকে। একসময় ছুটে গিয়ে লাল কাপড়ে মোড়া কোরান শরীফ এনে আমার মাথায় চেপে ধরে, এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে ও আল্লা, পাক কালামের দোহাই লাগে। ও আল্লা, পাক কালামের দোহাই লাগে।

আমার ব্যথা একসময় কমতে থাকে। ফুলির মা’র ধারণা কোরান শরীফ মাথায় চুঁইয়ে পাক কালামের দোহাই দেয়াতে ব্যথা কমেছে।

আজ পাক কালামের দোহাই-এও কাজ হয় নি। দুপুরে খাবার পর শুয়ে আছি। বাবা বললেন, টিয়া, আমাকে একটু জায়গা দে তো মা, তোর পাশে শুয়ে থাকি। আজ কেন জানি মারাত্মক ঘুম পাচ্ছে।

আমি বললাম, আমার বিছানায় কষ্ট করবে কেন। মা'র বড় বিছানায় আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাও।

বাবা বললেন, দরকার নেই। আমি ঘুমুচ্ছি, এর মধ্যে তোর মা যদি চলে আসে তাহলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুরু হবে।

আমি বললাম, তোমাদের এইসব ঝামেলা কবে মিটবে বলো তো?

বাবা রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন, খুব শিগগির মিটবে। আমি এমন এক পরিকল্পনা করেছি না মিটে উপায় নেই।

পরিকল্পনাটা কী?

তোকে বলা যাবে না।

আমাকে বলল– আমি তোমাকে সাহায্য করব।

সাহায্য করবি?

হুঁ।

তোর মা'র সঙ্গে তোর যা খাতির পরে একদিন তুই তোর মা'কে ফাস করে দিবি- আমি পড়ব মহাযন্ত্রণায়।

কোনোদিন ফাঁস করব না বাবা।

তাহলে শোন...।

এই বলে যেই বাবা আমার পাশে বসলেন, ওমনি আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। তীব্র ভয়াবহ যন্ত্রণায় মাথা টুকরো টুকরো হবার জোগাড় হলো। মনে হচ্ছে সূর্যটা দুভাগ হয়ে আমার দুচোখে ঢুকে পড়েছে। আমি গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলাম, আমার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে শুরু করল। ফুলির মা কোরান শরীফ হাতে ছুটে এসে বলতে লাগল আল্লাহ পাকের পাক কালামের দোহাই। আল্লাহ পাকের পাক কালামের দোহাই।

বাবা আমার পাশে বসেছিলেন। তিনি হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাত দিয়ে আমাকে ছুঁলেন না। তিনি থর থর করে কাঁপছেন। আমি গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে বললাম, বাবা তুমি চলে যাও। বাবা তুমি চলে যাও।

বাবা ছুটে দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন। তারো অনেক অনেক পরে ব্যথা কমল। আমি তাকালাম ফুলির মা'র দিকে– ফুলির মা'র সারা শরীর ঘামে ভিজে চপচপ করছে। মনে হচ্ছে এই এক্ষুনি সে বুঝি গোসল সেরে ফিরল।

আমি হাসিমুখে বললাম, বুয়া ঠাণ্ডা পানি খাব।

ফুলির মা পানি আনতে যাচ্ছে। সে ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না। এলোমেলোভাবে পা ফেলছে। আজ বেচারির উপর দিয়ে খুব বড় ঝড় গেছে।

বাবার উপর দিয়েও ঝড় গেছে। বেচারা বাবা– কী ভয়ঙ্কর কষ্টই না পেয়েছে। ভয়ঙ্কর কষ্ট না পেলে এই অবস্থায় মেয়েকে ফেলে কেউ পালিয়ে যায়?

বাবা সে-রাতে আর ফিরলেন না। পরদিন নটার দিকে এলেন। গতদিনের অসুখ নিয়ে আমি এবং বাবা দুজনেই কেউ কোনো কথা বললাম না। দুজনই এমন ভাব করলাম যেন গতদিন কী ঘটেছিল আমরা ভুলে গেছি।

বাবার পরিকল্পনা শুনলাম। খুব হাস্যকর পরিকল্পনা, তবে আমার মনে হচ্ছে কাজ করবে। পরিকল্পনা কাজ করার জন্যে ঝড়বৃষ্টি দরকার এবং ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া দরকার। ঝড় যদি নাও হয় ভালো বৃষ্টি হলেও চলবে, তবে ইলেকট্রিসিটি চলে যেতে হবে। পুরো ঢাকা শহরের ইলেকট্রিসিটি চলে যাবার দরকার নেই আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেই হবে। এই সমস্যার সমাধান ফ্ল্যাটবাড়ির কেয়ারটেকারকে দিয়ে করানো যায়। তাকে চা-টা খাবার জন্যে কিছু টাকা দিলেই সে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্যে মেইন সুইচ অফ করে রাখবে। এখন অপেক্ষা শুধু বৃষ্টির।

বাবা বললেন, আজ আকাশের অবস্থা বেশি সুবিধার না। মনে হচ্ছে আজই বৃষ্টি হবে। একসাথে নেমে পড়া যাক কী বলিস।

আমি বললাম, হুঁ।

ফুলির মাকে দলে টানতে হবে। নয়তো সে ফাঁস করে দেবে।

ফুলির মাকে নিয়ে ভয় নেই বাবা। আমি ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠিক করে রাখব।

বাবা চলে গেলেন মোমবাতি এবং মোটা দড়ি কিনতে। এই পরিকল্পনায় খুব শক্ত এবং মোটা দশ গজের মতো দড়ি লাগে। মোমবাতি লাগে।

আমি উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছি। মাঝে মাঝেই জানালা দিয়ে তাকাচ্ছি আর ভাবছি- ইস, আকাশটা যদি আরেকটু কালো হতো

বাবা দড়ি-টড়ি নিয়ে ফিরে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই মা অফিস থেকে ফিরলেন। বাবাকে সবকিছু তড়িঘড়ি করে আমার খাটের নিচে লুকিয়ে ফেলতে হলো।

বাবা বললেন, আজ টিকিট কাটার কথা ছিল না? কেটেছ?

মা জবাব দিলেন না। কঠিন এবং রাগী চোখে বাবার দিকে তাকালেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ভয়ঙ্কর, কুৎসিত এবং নোংরা ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল।

আমার ব্যথার এই তীব্রতা মা আগে কখনো দেখেন নি। এই প্রথম দেখেছেন। তিনিও বাবার মতোই করলেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। আমি বললাম, মা, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে থেকো না। তুমি চলে যাও। চলে যাও।

বাবা যেভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন, মাও ঠিক সেই ভাবেই পালিয়ে গেলেন। কোরান শরীফ নিয়ে দৌড়ে এলো ফুলির মা। আর তখন ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। শুধু যে বৃষ্টি তা না– বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও শুরু হলো।

৮. প্রচণ্ড বর্ষণ হচ্ছে

প্রচণ্ড বর্ষণ হচ্ছে। বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। এই ঝড়-বাদল মাথায় নিয়ে দিলশাদ এগুচ্ছে। রিকশাওয়ালার পর্দাটা ফুটো। বৃষ্টির পানিতে তার শাড়ি মাখামাখি। বৃষ্টির পানিতে গা ভেজানো যায় কিন্তু দ্রুতগামী ট্রাকের চাকা থেকে ছিটকে আসা পানিতে ভিজলে গা ঘিন ঘিন করে।

একটা ট্রাক এসে দিলশাদকে ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। তবে দিলশাদের গা ঘিন ঘিন করছে না। সে মূর্তির মতোই রিকশায় বসে আছে। রিকশাওয়ালা মাথায় গামছা বেঁধে নিয়েছে। এতে তার কী উপকার হচ্ছে কে জানে। গামছা থেকে চুঁইয়ে পানি পড়ছে। সে পেছন ফিরে বলল, এমুন দিনে ঘর থাইক্যা বাইর হওন ঠিক না আম্মা। আসমান ভাইঙ্গা পড়ছে। দেহেন অবস্থা।

.

অনেকক্ষণ কলিংবেল বাজার পর দরজা খুলল। ওয়াদুদুর রহমান বলল, আরে তুমি। বৃষ্টিতে একেবারে দেখি মাখামাখি।

দিলশাদ বলল, আসব দুলাভাই?

এসো এসো। তুমি আসবে না তো কে আসবে।

আপনার কার্পেট বোধহয় ভিজিয়ে ফেললাম।

ভিজুক না কত ভিজবে।

দিলশাদ ঘরে ঢুকল। ওয়াদুদুর রহমানের দিকে তাকাল। শান্ত সহজ গলায় বলল, আমি টাকাটার জন্যে এসেছি। আসুন আপনার বাথটাব উদ্বোধন করা যাক।

ওয়াদুদুর রহমান বলল, ও।

ওয়াদুদুর রহমান চোখ সরু করে তাকাচ্ছে। তার ভুরু একটু যেন ঝুঁকে এসেছে। দিলশাদ নিজেই বসার ঘরের খোলা দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, আসুন, আপনার বাথটাব উদ্বোধন করা যাক। ময়লা পানিতে শরীর নোংরা হয়ে আছে। নোংরা শরীর নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে না। আগে সাবান মেখে ভালো করে গোসল করে নেই।

.

০৯.

আজ বৃহস্পতিবার।

শুক্র-শনি-রবি, এই তিনদিন আমার হাতে আছে। সোমবার আমি চলে যাচ্ছি। সোমবার রাত দুটায় আমাদের বিমান। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার সঙ্গে মা যাচ্ছেন না। যাচ্ছেন বাবা। বাবার জন্যেই টিকিট কাটা হয়েছে।

এরকম একটা কাণ্ড যে শেষ মুহূর্তে মা করবেন তা আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম। যেদিন বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে তার পাসপোর্ট নিয়ে এসে মাকে বললেন— দিলশাদ, আমিও তোমাদের সঙ্গে ভিসা করিয়ে রাখি। যদি টাকাপয়সা বেশি জোগাড় হয়ে যায় আমিও যাব।

আমি মার দিকে তাকালাম। মা চোখ-মুখ কঠিন করে বললেন, টাকাটা আসবে কোত্থেকে? আকাশ থেকে?

বাবা আমতা আমতা করতে লাগলেন। তার এক বন্ধু আছে জার্মানিতে, তাকে চিঠি লিখবেন– এইসব কী হাবিজাবি বলতে লাগলেন। মা বাবার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। মার চোখ দেখেই বুঝলাম শেষ মুহূর্তে মা বাবার জন্যেই টিকিট কাটবেন। কারণ মা'র কঠিন চোখে মমতার ছায়া পড়ছিল। বাবা যখন খুব বেশিরকম আমতা আমতা করতে লাগলেন– তখন মার চোখে একধরনের রসিকতা ঝলমলিয়ে উঠল। সেদিন আমি ডায়েরিতে লিখলাম–আমার ধারণা, আমেরিকায় মা আমার সঙ্গে যাবেন না। বাবা যাবেন।

ডায়েরিতে লিখে আমি মনে মনে অপেক্ষা করছি– দেখি আমার কথা ঠিক হয় কি-না। তারপর একদিন মা টিকিট কেটে দুপুরবেলা বাসায় এলেন। বাবা বাসাতেই ছিলেন। তিনি কোত্থেকে যেন একটা ধাঁধা শিখে এসেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি পারলাম না। ফুলির মাকে জিজ্ঞেস করলেন- ফুলির মাও পারল না। আমি তখন বাবাকে বললাম, মাকে জিজ্ঞেস কর। মা পারবে। মা'র বুদ্ধি অনেক বেশি। বাবা বললেন, তোর মা পারবে না। যাদের বুদ্ধি বেশি তারা এটা পারে না। যাদের বুদ্ধি বেশি তারা চট করে জবাব দিতে গিয়ে ভুল করে।

যাই হোক, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি কখন মা আসবে, বাবা মা'কে ধাঁধাটা জিজ্ঞেস করবে।

মা এলেন। খুব ক্লান্ত হয়ে এলেন। এসেই বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমার ঘরে এলেন। আমি বললাম, মা, বাবা তোমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করবে।

মা বললেন, ধাঁধা জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।

আমি বললাম, প্লিজ মা। প্লিজ।

মা বাবার দিকে তাকাতেই বাবা ধাঁধা শুরু করলেন– এক বোবা-কালা গিয়েছে পেরেক কিনতে। দোকানদারকে সে হাতে হাতুড়ির মতো ইশারা করে পেরেকের কথা বলল। দোকানদার পেরেকের বদলে হাতুড়ি এনে দিল। তখন সেই বোবা-কালা একহাতে পেরেক ধরার ভঙ্গি করে অন্যহাতে হাতুড়ি মারার মতো করল। তখন দোকানদার বুঝতে পেরে পেরেক এনে দিল। তার কিছুক্ষণ পর দোকানে এক অন্ধ এসে উপস্থিত। তার দরকার একটা কেঁচি। এখন বলো দেখি ঐ অন্ধ কেঁচির কথাটা কীভাবে দোকানদারকে বুঝাবে?

আমি মার দিকে তাকিয়ে আছি। মা কী বলেন- শোনার জন্যে ছটফট করছি। মা ডানহাত উপরে তুলে আঙুল দিয়ে কেঁচির মতো কাটার ভঙ্গি করলেন। আমি এবং বাবা দুজনই হো হো করে হেসে ফেললাম। আমি বললাম, মা, ঐ অন্ধ লোক তো মুখেই বলবে– আমার কেঁচি দরকার। সে আঙুল দিয়ে দেখাবে কেন?

মা চমকে উঠে বললেন, আরে তাই তো?

আমি এবং বাবা দুজনই আবারো হেসে উঠলাম। মা নিজেও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। আমার এত ভালো লাগল। কত বছর পর তিনজন মিলে হাসছি। আশ্চর্য!

আমাদের হাসি থামার পর মা হ্যান্ডব্যাগ থেকে টিকিট বের করে বাবাকে বললেন, নাতাশার সঙ্গে তুমি আমেরিকা যাচ্ছে। আমি তোমার টিকিট কেটেছি। কাজেই ওর সব কাগজপত্র তোমাকে খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে। বাবা এমনভাবে মার দিকে তাকাচ্ছেন যেন মার কথা তিনি বুঝতে পারছেন না। যেন মা একজন বিদেশিনী। অদ্ভুত কোনো ভাষায় কথা বলছেন। যে ভাষা বাবার জানা নেই। মা বললেন, তুমি কাপড়চোপড় কী নেবে গুছিয়ে নাও। সময় তো বেশি নেই।

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, তুমি যাচ্ছ না?

বললাম তো না। একটা কথা ক'বার করে বলব?

না–মানে, মানে...।

মা উঠে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাবা হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে আমাকে কিছু না বলেই দ্রুত বের হয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন কে জানে। হয়তো নিজের জিনিসপত্র গোছাতে গেলেন। কিংবা অন্যকিছু। আমি একা একা শুয়ে আছি। আমার ভালো লাগছে না, আবার খারাপও লাগছে না। এটা বেশ অদ্ভুত অবস্থা। আমাদের জীবনটা হয় ভালো লাগায়, নয় খারাপ লাগায় কেটে যায়। ভালোও লাগে না, খারাপও লাগে না এরকম কখনো হয় না। হলেও খুব অল্প সময়ের জন্যে হয়।

আমি আমার খাতাটা হাতে নিলাম। চিঠিগুলি লিখে ফেলা দরকার। কাকে কাকে লিখব? মাকে, বাবাকে, নানিজানকে এবং ফুলির মাকে। ফুলির মা চিঠি পড়তে পারবে না। অন্যকে দিয়ে সেই চিঠি সে পড়িয়ে নেবে। হয়তো মাকে দিয়ে পড়াবে। কেউ যখন চিঠি পড়ে শোনায় তখন ফুলির মা গালে হাত দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে থাকে। তখন তাকে দেখে মনে হয় জগতের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সে করছে। এতদিন দেশ থেকে আসা তার সব চিঠি আমি পড়ে শুনিয়েছি। তার হয়ে চিঠি লিখে দিয়েছি আমি। ফুলির মা লেখাপড়া না জানলেও চিঠি লেখার সব কায়দাকানুন জানে। খুব ভালো করে জানে।

আফা, চিডির উফরে সুন্দর কইরা লেহেন সাতশ ছিয়াশি।

সাতশ ছিয়াশি লিখব কেন?

এইটা আফা চিডির দস্তুর। লেহেন সাতশ ছিয়াশি।

লিখলাম।

এহন লেখেন– পাক জনাবেষু, বাদ সমাচার...।

হুঁ লিখলাম।

ফুলির মা'র জন্যে চিঠি লেখা খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কত কী যে সেই চিঠিতে থাকে! তার দেশের কে কেমন আছে সব জানতে চাওয়া হয়। কার অসুখ হয়েছে, কোন মেয়েকে

শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে... ফুলির মা'র জন্যে চিঠি লিখতে লিখতে সব আমার জানা হয়ে গেছে।

তার গ্রামে আমি যদি কখনো বেড়াতে যাই তাহলে সবাইকেই আমি চিনব।

ফুলির মা'র প্রতিটি চিঠি লেখা হবার পর তাকে পড়ে শুনাতে হয়। সে প্রায় দম বন্ধ করে চিঠি শুনে, তারপর শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে। সাদামাটা চিঠি পড়ে তার চোখে পানি আসে কেন কে জানে।

আমি ঠিক করেছি আমি প্রতিটি চিঠি শেষ করে ফুলির মা'র মতো একটু কাঁদব। এক ফোঁটা হলেও চোখের পানি চিঠির কোনো এক কোনায় মাখিয়ে রাখব। চোখের পানি শুকিয়ে যাবে, কেউ বুঝতে পারবে না। সেই ভালো। আমি চিঠি লিখা শুরু করলাম।

আগে আমি খুব দ্রুত লিখতে পারতাম– এখন পারি না। প্রায় সময়ই চোখ ঝাঁপসা হয়ে আসে- আন্দাজে লিখতে হয়। হাতের লেখা খারাপ হয়ে যায়। একসময় আমার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। আমি নিজে যেমন অসুন্দর হচ্ছি। আমার লেখাও তেমনি অসুন্দর হচ্ছে।

৭৮৬

প্রিয় ফুলির মা বুয়া,

তুমি আমার ভালোবাসা নাও।

তুমি যখন আমার এই চিঠি পড়বে তখন আমি বেঁচে থাকব না। মৃত্যুর পর পর মৃত মানুষটিকে সবাই দ্রুত ভুলে যেতে চেষ্টা করে। সেটাই স্বাভাবিক। যে নেই– বার বার তার কথা মনে করে কষ্ট পাবার কোনো কারণ নেই। তারপরেও যারা অতি প্রিয়জন তারা মৃত মানুষকে সবসময়ই মনে রাখে। এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। মৃত মানুষও হয়তো জীবিতদের মনে রাখে।

তুমি আমার অতি প্রিয়জনের একজন। প্রিয়জন কে হয় তা কি তুমি জানো? প্রিয়জন হচ্ছে সে যে দুঃখ ও কষ্টের সময় পাশে থাকে।

বেশিরভাগ মানুষের স্বভাব হচ্ছে বিড়ালের মতো। তারা সুখের সময় পাশে থাকে। দুঃখ-কষ্ট যখন আসে তখন দুঃখ কষ্টের ভাগ নিতে হবে এই ভয়ে চুপি চুপি সরে পড়ে। তাদের কোনো দোষ নেই– আল্লাহ মানুষকে এমন করেই তৈরি করেছেন।

তারপরেও কিছু কিছু মানুষ আছে যারা দুঃখ-কষ্টের সময় পাশে এসে দাঁড়ায়। দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো বড় কোনো অস্ত্র তাদের হাতে থাকে না তাদের থাকে শুধু হৃদয়পূর্ণ ভালোবাসা।

তুমি আমার চরম দুঃখের এবং চরম কষ্টের সময়ে আমার পাশে দাঁড়ালে। যেন আমি নাতাশা নামের কোনো মেয়ে না– আমি তোমার ফুলি।

আমার প্রচণ্ড মাথাব্যথার সময় তুমি সব কাজ ফেলে ছুটে এসে যখন দুহাতে আমাকে কোলে তুলে নিতে তখন তোমার মুখটা আমার মার মুখের মতো হয়ে যেত। আমার মা’র

গা থেকে যেমন গন্ধ বের হয় তোমার গা থেকেও তখন ঠিক সেই রকম গন্ধ বের হতো। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

ফুলির মা বুয়া, আমি তোমার কথা মনে রাখব। যে কদিন বাঁচব মনে রাখব। আমার এই মনে রাখা-না-রাখায় কিছু যায় আসে না। কিন্তু এর বেশি তো আমার কিছু করার নেই।

ভালোবাসা ডাবল করে ফেরত দিতে হয়। তোমার ভালোবাসা আমি ডাবল করে ফেরত দিতে পারব না। এত ভালোবাসা আমার নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিত, পৃথিবীর মানুষ আমার হয়ে তোমাকে তোমার ভালোবাসা ডাবল করে ফেরত দেবে।

মৃত্যুর পর আমি তোমার মেয়েকে খুঁজে বের করব। তাকে বলব তোমার মা একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। এই পৃথিবী তাঁর মতো ভালো মহিলা খুব কম তৈরি করেছে। ফুলি এই কথা শুনে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে।

তাহলে আজ যাই ফুলির মা বুয়া।

যাই কেমন?

ইতি—

তোমার আদরের

টিয়া পাখি নাতাশা।

সূচিপত্র

.

প্রিয় নানিজান,

আসসালামু আলাইকুম।

দেখলেন নানিজান, আপনার কথা আমি ভুলি নি। অনেক দিন আগে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। আপনি বলেছেন আমাদের 'নাতু' এত গুছিয়ে চিঠি লিখে, শুধু একটাই ত্রুটি– চিঠির শুরুতে আসোলামু আলাইকুম লেখে না।

এবার আপনি আর সেটা বলতে পারবেন না। নানিজান, আমার অসুখের পর আপনি শুধু দুবার আমাকে দেখতে এসেছেন। এই দুবারই যে আমার কী ভালো লেগেছিল! আপনি যে কত ভালো তা আপনি নিজে কি জানেন নানিজান? যেই আপনার কাছে আসে তারই মন ভালো হয়ে যায়।

আপনি হাসতে হাসতে গল্প করেন। কুট কুট করে পান খান। সামান্য কথায় হেসে ভেঙে পড়েন। তখন ঠোঁট বেয়ে লাল পানের পিক গড়িয়ে পড়ে। দেখতে কী যে সুন্দর লাগে।

আমরা বইপত্রে সবসময় পড়ি মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। সেই শ্রেষ্ঠ যে আসলে কী তা আপনাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। আমাদের বাংলা রচনা ক্লাসে একবার রচনা লিখতে দেয়া হলো তোমার জীবনের আদর্শ মানব। কেউ লিখল মহাত্মা গান্ধী, কেউ লিখল শেখ মুজিবুর রহমান। একজন লিখল, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, একজন লিখল মাদার তেরেসা। শুধু আমি লিখলাম—- আমার নানিজান।

বাংলা আপা আমার সেই রচনা ক্লাসে সবাইকে পড়ে শুনালেন। তারপর বললেন, নাতাশা, তোমার নানিজান সারাক্ষণ শুধু হাসেন এইজন্যেই কি তিনি তোমার জীবনের আদর্শ মানব?

আমি বললাম, চরম দুঃখেও তিনি হাসেন।

বাংলা আপা বললেন, তোমার রচনা খুব সুন্দর হয়েছে। দশের ভেতর আমি তোমাকে সাড়ে ছয় দিলাম, কিন্তু নাতাশা, একটা কথা মনে রাখবে- আদর্শ মানব তিনিই হবেন যিনি তার কর্ম নিজের এবং নিজের সংসারের বাইরে ছড়িয়ে দেবেন। বিরাট একটা মানবগোষ্ঠী যাতে উপকৃত হবে। তোমার নানিজান কি এমন কিছু করেছেন যাতে বিরাট মানবগোষ্ঠী উপকৃত হয়েছে?

জি-না।

এইখানেই সমস্যা, বুঝলে নাতাশা। তোমার রচনা পড়ে আমি নিশ্চিত তোমার নানিজান অসাধারণ একজন মহিলা। তাঁকে আমার দেখতেও ইচ্ছা করছে। কিন্তু তিনি তাঁর অসাধারণত্ব বাইরে ছড়িয়ে দিতে পারেন নি। নিজের সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আটকে রেখেছেন। কাজেই তাকে তুমি আদর্শ মানুষ হিসেবে নিও না।

আমি বললাম, জি আচ্ছা।

বাংলা আপা বললেন, তোমার নানিজানকে বাদ দিয়ে তোমার জীবনে আদর্শ মানব কে এখন বলল দেখি।

আমি অনেক ভাবলাম, তারপরেও মনে হলো– নানিজান। অবশ্যি আপাকে বললাম– বেগম রোকেয়া আপা একটু লজ্জা পেলেন কারণ তাঁর নামও রোকেয়া।

আমি জানি, আপনি আমার চিঠি পড়ে লজ্জা পাচ্ছেন। আপনার প্রশংসা করে কেউ কিছু বললেই আপনি লজ্জা পান। এবং আপনি যখন ভালো কিছু করেন এমনভাবে করেন যে কেউ বুঝতে পারে না ভালো কাজের পেছনের মানুষটা আপনি।

নানাভাই একটা স্কুলে এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আমার তখনি সন্দেহ হলো এর পেছনে আছেন আপনি। নানাভাই একদিন আমাকে দেখতে এলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতগুলি টাকা হঠাৎ স্কুলে দিলেন কেন নানাভাই?

তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, আরে তোর নানিজান একদিন ভোরবেলা আমাকে বলে সে আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখেছে। তিনি বলছেন– বৌমা, দীর্ঘদিন আমি এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। আজ স্কুলের ভগ্নদশা দেখে আমার মনটা খারাপ হয়েছে। তুমি স্কুলের সাহায্যের একটা ব্যবস্থা কর।

তখন টাকাটা দিলেন?

আরে না। তোর নানিজানের যা স্বভাব, রোজ কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যানে জীবন অতিষ্ঠ। টাকাটা দিয়ে ঘ্যানঘ্যানানির হাত থেকে বেঁচেছি।

তখন আমার মনে হলো স্বপ্নের ব্যাপারটাও আপনি বানিয়ে বলেছেন। আপনি কোনো স্বপ্ন-টপ্ন দেখেন নি। আপনার স্কুলে সাহায্য করার ইচ্ছা হয়েছে, তাই মিথ্যা একটা গল্প বলে নানাভাইয়ের হাত থেকে টাকা বের করেছেন।

নানিজান, আমি যখন আমার সন্দেহের কথা আপনাকে বললাম- তখন আপনি হাসতে হাসতে বিছানায় প্রায় গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে বললেন, আল্লাহপাক তোকে এত বুদ্ধি কেন দিল রে নাতু?

নানিজান, আপনার সব কথার মধ্যে শুধু আল্লাহপাক। সুন্দর একটা ফুল দেখেও আপনি বলেন- আহা রে আল্লাহপাক কী সুন্দর করেই না ফুলটা বানিয়েছে! শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

নানিজান, আপনার মতো আল্লাহ-ভক্ত মানুষ বাংলাদেশে নিশ্চয়ই আরো অনেক আছে, কিন্তু আপনার মতো এত সুন্দর করে আল্লাহর কথা আর কেউ বলে, তা আমার মনে হয় না। শেষবার যখন আপনি আমাকে দেখতে এলেন, তখন আপনাকে আমি একটা কঠিন প্রশ্ন করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, আপনি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। কিন্তু আপনি হাসিমুখে জবাব দিলেন। আমি বললাম, আচ্ছা নানিজান, আমার এই কঠিন অসুখটা কি আল্লাহ দিয়েছেন? কেন দিলেন? আমি তো কোনো অন্যায় করি নি। কোনো পাপ করি নি। তিনি কেন আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন? আর শাস্তি তো তিনি শুধু আমাকে দিচ্ছেন না, আমার সঙ্গে মা-বাবাকেও শাস্তি দিচ্ছেন এমনকি আপনি শাস্তি পাচ্ছেন। কেন?

আপনি তখন আমার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, কঠিন যে পাপী তাকে শাস্তি দিতেও আল্লাহপাক দ্বিধাবোধ করেন। তিনি নিজে সুন্দর। যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেন তাও

সুন্দর। রোগব্যাধি অসুন্দর। আমার মনে হয় না– এই রোগ এই ব্যাধি তার তৈরি। তিনি প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। তাকে আপন মনে চলতে দিয়েছেন। রোগব্যাধি জন্মেছে। তিনি সেখানে হাত দেন নি। সবকিছুকেই তিনি তাঁর মতো চলতে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট জীবন যখন রোগব্যাধিতে কষ্ট পায় তখন তিনিও কষ্ট পান।

সেই কষ্ট তিনি দূর করেন না কেন?

দূর করবেন না কেন– করেন। সেই জন্যেই তো চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবে হুট করে তিনি কিছু করেন না। তাতে জগতের নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। জগতের আইনকানুনগুলিও তাঁর সৃষ্টি, কিন্তু তিনি তা ভাঙেন না। আইন ভাঙা মানেই অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করা। সৃষ্টিকর্তা তা হতে দিতে পারেন না।

তবে ইচ্ছা করলে তিনি পারেন। তাই না নানিজান?

অবশ্যই পারেন। পারেন বলেই তো আমরা সবসময় তার কাছে প্রার্থনা করি। মানুষ যখন মহাবিপদে পড়ে, যখন চরম দুঃসময়ের মুখোমুখি হয়, তখন তারা আল্লাহর উপর রাগ করে। তাদের দুঃখকষ্টের জন্যে আল্লাহকে দায়ী করে। মানুষের দুঃখকষ্টের দায়িত্ব মানুষের, আল্লাহ দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করেন না। তিনি সুন্দরের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সুন্দর সৃষ্টি করেন। বুঝতে পারছিস?

হুঁ।

নানিজান, আপনি তখন আমার চুলে বিলি দিতে দিতে আরো অনেক কথা বলতে লাগলেন। আপনি গভীর বিশ্বাস থেকে কথা বলেন বলেই সহজে সেইসব কথা মনে গেঁথে যায়।

আপনার সব কথা সেদিন আমি মনে গেঁথে নিয়েছি। আমার মনটা হালকা হয়ে গেছে। তখন নানিজান, আপনি আমার কানে কানে অদ্ভুত একটা কথা বললেন, আপনি বললেন...।

কী বললেন তা তো আপনার মনেই আছে, তাই না? মৃত্যু আমার পাশে এসে যখন বসবে তখন আপনার কথাগুলি ভেবে আমি মনে সাহস পাব।

নানিজান, আপনি আমাকে যেভাবে সাহস দিলেন, আমার মা এবং বাবাকেও এইভাবেই সাহস দেবেন। আপনার কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ।

ইতি

আপনার নাতু

.

প্রিয় বাবা,

বাবা, তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি সেটা কি তুমি জানো? জানো না, তাই না?

আমিও জানি না। ভালোবাসা যদি তরল পানির মতো কোনো বস্তু হতো তাহলে সেই ভালোবাসায় সমস্ত পৃথিবী তলিয়ে যেত। এমনকি হিমালয় পর্বতও।

বাবা, আমি যখন থাকব না তখন তুমি আমার কথা ভেবে কষ্ট পেও না। তুমি কষ্ট পেলে সেই কষ্ট কোনো না কোনো ভাবে আমার কাছে পৌঁছবে। তখন আমার খুব খারাপ লাগবে।

বাবা, তুমি মাকে সাহস দিও। আদর-ভালোবাসা দিয়ে তুমি মা'র মনের সব কষ্ট দূর করে দিও।

মনে রেখো বাবা, তোমাকে অবশ্যই লাল রঙের একটা গাড়ি কিনে আগের দিনের মতো মা'কে পাশে বসিয়ে হাইওয়ে দিয়ে শো শো করে চালাতে হবে। মনে থাকবে তো বাবা?

তোমার টিয়া পাখি।

.

প্রিয় মা-মণি,

মা, আমি তোমাকে ছেড়ে কখনো যাব না। মৃত্যুর পরেও আমি থাকব তোমার খুব কাছে। তোমার আনন্দ দেখে আমি হাসব আবার তুমি যখন দুঃখ পাবে তখন আমিও খুব দুঃখ পাব। কাজেই মা দুঃখ পেও না। মন খারাপ করো না। বাবা যখন লাল গাড়ি কিনবে তখন তুমি বাবার পাশে হাসতে হাসতে বসবে। বাবা যখন শ শ করে গাড়ি চালাবে তখন তুমি চুল বেঁধে রাখবে না, চুল ছেড়ে দিও। বাতাসে মাথার চুল উড়লে খুব সুন্দর লাগবে দেখতে। সেই সুন্দর দৃশ্য আমি একদিন দেখব ভাবতেই ভালো লাগছে।

আদরের মা-মণি! তোমাকে আমি খুব খুব সুখী করব এরকম একটা ইচ্ছা ছিল। তুমি চেয়েছিলে আমি ডাক্তার হব। আমি ভেবেছিলাম খুব বড় একজন ডাক্তার হব। এমন ডাক্তার যে হাসিমুখে রোগীর ঘরে এসে দাঁড়ালেই রোগ অর্ধেক সেরে যায়।

আমি তা পারলাম না মা। রোগে নিজে কষ্ট করলাম, তোমাকে কষ্ট দিলাম। অসুখের চিকিৎসার জন্যে টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তুমি কত না অপমানের ভেতর দিয়ে গেলে। তোমাকে আমি এই কষ্ট, এই অপমানে ফেলেছি– তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও, মা।

নানিজান আমাকে বলেছেন- মৃত্যুর ঠিক আগে আগে মানুষ আল্লাহপাকের কাছে অন্যের জন্যে যে প্রার্থনা করে আল্লাহপাক তা শুনেন। শুধু তার নিজের জন্যে যে প্রার্থনা করে তা শুনেন না।

আমি ঠিক করে রেখেছি, মৃত্যুর ঠিক আগে আগে আমি আল্লাহকে বলব হে আল্লাহ, তুমি আমার মার মন থেকে আমার সমস্ত স্মৃতি সরিয়ে নিয়ে যেও। কোনোদিন যেন আমার কথা ভেবে মা কষ্ট না পায়। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমার সেই প্রার্থনা শুনবেন।

মা শোন, ফুলির মা বুয়া আমার জন্যে কী যে কষ্ট করেছে। তা শুধু সে জানে। তুমি অবশ্যই তার শেষদিন পর্যন্ত তাকে দেখবে। তার খুব শখ, বিয়ে করে সে ঘরসংসার করে, তার আবার ছেলেপুলে হয়। কতবার যে সে আমাকে তার গোপন শখের কথা বলেছে। মাগো, তুমি দেখো তো এটা পারা যায় কি-না। আর তার বিয়েতে তুমি তাকে লাল রঙের একজোড়া স্যান্ডেল কিনে দেবে। লাল রঙের স্যান্ডেলেরও তার খুব শখ।

আসি মা?

তোমার অতি আদরের

নাতাশা

পুনশ্চ : মা, তুমি কি একবার কষ্ট করে আমাদের স্কুলে যাবে? আমাদের বাংলা আপাকে (মিস রোকেয়া) বলবে গুরু নানকের কথাটা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। খুব সত্যি। আর আমাদের অঙ্ক আপাকে (মিস শাহেদা) বলবে স্কুলের সব মেয়েরা তাকে যমের মতো ভয় করলেও তিনি সবার খুব প্রিয়। সবাই যে তাঁকে ভয় পায় তা তিনি জানেন। কিন্তু তিনি যে সবার খুব প্রিয় তা জানেন না। তার জানা দরকার। এবং এদের দুজনকেই তুমি আমার সালাম দেবে।

৯. ফুলির মা শেষপর্যন্ত

ফুলির মা শেষপর্যন্ত পাঁচশ টাকার একটা চকচকে নোট জোগাড় করেছে। তার কাছে মোট চারশ আশি টাকা ছিল। মাত্র বিশটা টাকার জন্যে পাঁচশ টাকা হচ্ছিল না। শেষ মুহূর্তে সুযোগ হলো। সে বাথরুম পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে, বাথরুমের বেসিনের উপর কুড়ি টাকার একটা নোট আধা ভেজা অবস্থায় পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ সে নোটটা নিয়ে বের হয়ে এলো।

তার একটু ভয় ভয় করছিল— দিলশাদ টের পায় কি-না। মনে হয় টের পাবে। আজ নাতাশা চলে যাচ্ছে, তার মন পুরোপুরি সেদিকে। বিশ টাকার নোট কোথায় ফেলে রেখেছে এটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা না।

ফুলির মা ভাঙতি টাকা সব নিয়ে মোড়ের দোকানে গেল। ভাঙতি টাকার বদলে চকচকে একটা পাঁচশ টাকার নোট নিয়ে এলো। তার খুব ইচ্ছা সে নাতাশা আপার চিকিৎসার জন্যে কিছু দেয়। তার মতো মানুষের কাছ থেকে তো এরা টাকা নেবে না। কাজেই টাকাটা দিতে হবে গোপনে। পাঁচশ টাকার নোটটা সে আপার ব্যাগে একফাঁকে ঢুকিয়ে দেবে। ব্যাগ খুলতে গেলে টাকা বের হয়ে আসবে। টাকার গায়ে নাম লেখা থাকে না। কাজেই তখন টাকাটা পাওয়া গেলে কেউ বুঝতে পারবে কে টাকাটা দিয়েছে।

পাঁচশ টাকার নোট আঁচলে বেঁধে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুলির মা দারুণ দুঃশ্চিন্তায় কাটাল– আপার ব্যাগে সে টাকাটা রাখার সুযোগ পাচ্ছে না। সবসময় ঘরে লোকজন। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ

সুযোগ হয়ে গেল। দিলশাদ বলল, ফুলির মা, নাতাশার ব্যাগে ধুলা জমে আছে। ধুলা ঝেড়ে দাও।

ফুলির মা ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে একফাঁকে ব্যাগের পকেটে নোটটা ঠেসে দিয়ে দিল। এখন আর চিন্তা নেই। নিশ্চিন্ত মনে সে ঘরের অন্যসব কাজ করতে পারে।

আপারা রাত বারোটার সময় রওনা হবে। ঘরের মেলা কাজ পড়ে আছে। তারা রাতে খেয়ে যাবে। পাকশাক করতে হবে। ফুলির মা খুশিমনে রান্নাঘরে ঢুকল। কোরান শরীফটা ঢুকিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হতো। বিদেশে মাথাব্যথা কমানোর জন্যে দরকার হতে পারে। ফুলির মা কোরান শরীফ ঢুকানোর সুযোগ পায় নি। ব্যাগে জায়গাও নেই।

.

এয়ারপোর্ট যাবার জন্যে দুটা গাড়ি এসেছে। এয়ারপোর্ট দিলশাদরা যাচ্ছে, তার বাবা-মা যাচ্ছেন। দিলশাদের দুই বোনও যাচ্ছে। দিলশাদের মেজো দুলাভাই যাচ্ছে। বড়জন যাচ্ছে না, সে ঢাকায় নেই।

দিলশাদ ফুলির মাকে বলল, ফুলির মা, কাপড়টা বদলে তুমিও এয়ারপোর্টে চল।

ফুলির মা বলল, ধোয়া পাকলা সব বাকি। আমি গেলে কাজকাম কে করব!

এসে করবে যা করার।

জি-না আম্মা, আফনেরা যান। ঘর আউলা রাইখ্যা আমি যামু না। আমার উড়োজাহাজ দেখনের শখ নাই।

সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠেছে। নাতাশা রান্নাঘরে গেল ফুলির মা'র কাছ থেকে বিদায় নিতে। দিলশাদ মেয়ের হাত ধরে ছিল। নাতাশা বলল, মা, আজ আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে। আমি একা একা রান্নাঘরে গিয়ে ফুলির মা বুয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

দিলশাদ বলল, আচ্ছা যাও।

নাতাশা রান্নাঘরে ঢুকে বলল, বুয়া, আমি যাচ্ছি। ফুলির মা নাতাশার দিকে না তাকিয়ে বলল, আইচ্ছা আফা যান। আল্লাহর হাতে সোপার্ট।

ফুলির মা চোখ তুলে তাকাল না। কারণ চোখ তুলে তাকালেই সে কেঁদে ফেলবে। যাত্রার সময় চোখের পানি খুব অলক্ষণ। তার কারণে আপার অলক্ষণ সে হতে দেবে না। দরকার হলে চোখ গেলে ফেলবে কিন্তু কাদবে না।

নাতাশা বলল, চলে যাচ্ছি তো, আমাকে একটু আদর করে দাও।

আমার হাত ময়লা তো আফা। আমি পারুম না। দিরং কইরেন না, রওনা দেন।

নাতাশাদের গাড়ি রওনা হবার পর ফুলির মা রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করল। তারপর মেঝেতে গড়াগড়ি করে কাঁদতে লাগল। চিৎকার করে বলতে লাগল, ও আমার আফারে! ও আমার আফারে!

.

দুটা গাড়ির একটিতে নাতাশা, তার বাবা এবং নাতাশার নানাভাই। অন্য গাড়িতে মনোয়ারা আর দিলশাদ। দিলশাদের দুইবোন তাদের গাড়িতে করে আলাদা এয়ারপোর্টে যাবে। এদের সঙ্গে যাচ্ছে না। মনোয়ারা গাড়িতে সারাক্ষণ তার মেয়ে দিলশাদের হাত ধরে রাখলেন।

দিলশাদ এয়ারপোর্টে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে বলল, মা, আমার এয়ারপোর্টের ভেতর যেতে মন চাচ্ছে না। আমি বাইরে থাকি।

মনোয়ারা বললেন, বেশ তত থাক।

তুমি আমার সঙ্গে থাকো মা।

আচ্ছা আমি থাকব। আয় আমরা একটা নির্জন জায়গা দেখে বসি।

আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে মা। এয়ারপোর্টে রওনা হবার আগে বারান্দায় গিয়ে দেখি আমার সবকটা অর্কিডে ফুল ফুটেছে। নীল নীল ফুল বারান্দা আলো হয়ে আছে।

বলিস কী! একবার গিয়ে দেখে আসব।

এটা নিশ্চয়ই খুব ভালো লক্ষণ। তাই না মা?

অবশ্যই ভালো লক্ষণ।

মা, তুমি কি নাতাশার বাবাকে চুপি চুপি একটা কথা বলে আসবে?

কী কথা?

তুমি তাকে বলবে আমি এয়ারপোর্টে ঢুকব না। সে যেন নাতাশাকে আমার কাছে না আনে।

আদা বলে আসছি।

নতুন সাদা ড্রেসটায় নাতাশাকে কী স্মার্ট লাগছে দেখছ মা?

হ্যাঁ, দারুণ সুন্দর লাগছে।

কেমন গট গট করে হাঁটছে দেখছ মা?

হ্যাঁ দেখছি। আজ মনে হয় ওর শরীরটা ভালো।

মা, তুমি আমার হয়ে ওর নাকে একটা চুমু দিয়ে এসো।

আচ্ছা মা। দেব।

.

নাতাশা তার বাবার হাত ধরে ইমিগ্রেশন এরিয়ার ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে। তার খুব লজ্জা লজ্জা লাগছে। এত মানুষ এসেছে তাকে বিদায় দিতে। তাদের স্কুল থেকে চারজন আপা

এসেছেন। আজ সে যাচ্ছে এই খবরটা তারা কীভাবে পেলেন কে জানে। তাদের ফ্ল্যাট বাড়ি থেকেও প্রায় সবাই এসেছে। ঐ তো তার মা'র অফিসের বস রহমান সাহেব। তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। এত বড় একজন অফিসার গভীর রাতে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছেন।

এমন অনেকে এসেছে যাদের নাতাশা চেনে না। তাঁর বাবার এক ফুফু এসেছেন– অতি বৃদ্ধা। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে এসেছেন।

নাতাশা সবাইকে এয়ারপোর্টে দেখতে পাচ্ছে শুধু তার মাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে একসময় বলল, মা কোথায় বাবা!

সাজ্জাদ বলল, তোমার মা এয়ারপোর্টের বাইরে। তার খুব মাথা ধরেছে। সে ভিড় সহ্য করতে পারছে না। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। চল আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ি।

চল।

দেখ কত মানুষ তোমাকে সি-অফ করতে এসেছে। ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হাত নাড়।

নাতাশা হাত নাড়ল। হাত নাড়তে গিয়ে দেখল, ডাক্তার সাহেবও এসেছেন। পিজির নিওরোসার্জন প্রফেসর ওসমান। পায়জামা-পাঞ্জাবিতে ভদ্রলোককে কী সুন্দর লাগছে! উনি হাসিমুখে হাত নাড়ছেন। নাতাশা বলল, বাবা দেখ– পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা ঐ ভদ্রলোক আমার ডাক্তার। উনার নাম– ওসমান। উনার চোখ খুব সুন্দর। চশমা দিয়ে চোখ ঢাকা, এইজন্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ না।

সাজ্জাদ বলল, তাই বুঝি?

সাজ্জাদের গলার স্বর খুব ভারী শুনাল। পুরুষমানুষ কাঁদে গোপনে। তখন তাদের চোখ দিয়ে পানি বের হয় না। শুধু তাদের গলা ভারী হয়ে যায়। কথা জড়িয়ে যায়।

বাবা!

কী গো মা?

শেষবারের মতো মা'কে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে।

সাজ্জাদ বলল, শেষবারের মতো দেখা আবার কী? তুমি ভালো হয়ে ফিরে আসবে। মাকে দেখতে দেখতে তোমার চোখ পচে যাবে।

নাতাশা শান্ত গলায় বলল, ও আচ্ছা।

.

এয়ারপোর্ট থেকে অনেকটা দূরে দিলশাদ তার মাকে নিয়ে ঘাসের উপর বসে আছে। মনোয়ারা পান খাচ্ছেন। জর্দার গন্ধে জায়গাটা ম ম করছে।

দিলশাদ বলল, তোমার হাতে কি ঘড়ি আছে মা--কটা বাজে?

মনোয়ারা বললেন, ঘড়ি নেই মা। রাত তিনটার মতো বোধহয় বাজে।

এক্ষুনি তাহলে নাতাশাদের প্লেন ছাড়বে। তাই না মা?

হুঁ।

মা, তোমার কি মনে হয় জীবিত অবস্থায় আমার মেয়ে ফেরত আসবে?

অবশ্যই আসবে মা।

সেদিন প্রচুর ফুল নিয়ে এয়ারপোর্টে আসতে হবে।

অবশ্যই ফুল নিয়ে আসতে হবে। ঢাকা শহরে ফুলের দোকানের সব ফুল আমরা কিনে ফেলব।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে মা। বুকটা ফেটে যাচ্ছে কী করব বলো তো।

মা, একটু কাঁদতে চেষ্টা কর। কাঁদলে বুক হালকা হবে।

অনেকক্ষণ থেকেই কাঁদতে চেষ্টা করছি, পারছি না।

.

বিকট গর্জন করে ডিসি-১০ আকাশে উঠে গেল। দিলশাদ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিমানটি দেখার চেষ্টা করছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে। ঐ যে। সে উৎফুল্ল গলায় বলল- মা দেখ, দেখ।

আকাশভর্তি ঘন কালো মেঘ। বিজলি চমকাচ্ছে। ক্ষমতাধর মানুষের সৃষ্ট বিশাল যন্ত্রযান মেঘ কেটে উপরে উঠে যাচ্ছে। কত অবলীলাতেই না সে উড়ছে।

দিলশাদের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে মার দিকে হাত বাড়িয়ে শান্ত গলায় বলল, তুমি কুট কুট করে কী সুন্দর পান খাচ্ছ। তোমার মুখ থেকে একটু পান দাও তো মা।